ফয়যানে মদীনা

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া

Islamic Research Center

- কুরআন অবতীর্নের উদ্দেশ্যসমূহ (তৃতীয় ও শেষ পর্ব)
- মন লাগাবেন না
- আগুনের শিখা
- হযরত উমায়ের বিন ওয়াহাব জুমাহী رضی اللہ عنہ
- ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়েল
- ইতিকাফের রুহানিয়তে বাধা এবং এর সমাধান

ফয়যানে মদীনা

মার্চ ২০২৬

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

(তৃতীয় ও শেষ পর্ব)

কুরআন অবতীর্নের উদ্দেশ্যসমূহ

মাওলানা রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

মানুষের মাঝে ফয়সালা এবং বিধানসমূহ

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব মানুষের মাঝে ফয়সালা করার জন্য এবং তাদের স্পষ্ট বিধান দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে:

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَآىٕنِیْنَ خَصِیْمًا ۙ(۱۰۵)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করেন যেভাবে আল্লাহ্ আপনাকে দেখিয়েছেন এবং প্রতারণাকারীদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করোনা।

(পারা: ৫, সূরা নিসা: ১০৫)

সূরা মায়েদায় ইরশাদ হয়েছে:

وَ اَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ اَنْ یَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَیْكَ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং এ'যে, হে মুসলমান! আলাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তি করো এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা এবং তাদের থেকে বাঁচতে থাকো, যাতে কখনো তারা তোমাদের পদস্খলন না ঘটায় কোন বিধানের মধ্যে, যা তোমার প্রতি আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। (পারা: ৬, সূরা মায়েদা: ৪৯)

এই আয়াতগুলো স্পষ্ট করে যে, কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিধান। এটি মানুষের পারস্পরিক লেনদেন, অধিকার ও দায়িত্ব, পারিবারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক কারবার, রাজনৈতিক বিষয়াবলী, আইনি বিষয় এবং সব ধরণের মতভেদে স্পষ্ট ফয়সালা প্রদান করে। সমাজে যখন কুরআনী বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা হয়, তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, জুলুম নির্মূল হয় এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। কিন্তু যখন মানুষের মনগড়া আইনকে

প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখন সমাজে অবিচার, শোষণ এবং বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত

কুরআন অবতীর্ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করার জন্য এবং শিরক থেকে বের করার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে:

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا
لَّهُ الدِّیْنَ ﴿٢﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি এ কিতাব সত্য সহকারে অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং আল্লাহরই ইবাদত করুন নিরেট তাঁরই বান্দা হয়ে। (পারা: ২৩, সূরা যুমার: ২)

একইভাবে সূরা আনআমেও ইরশাদ হয়েছে:

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এ বরকতময় কিতাব আমি নাযিল করেছি; সুতরাং সেটার অনুসরণ করো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো যেন তোমাদের উপর দয়া হয়। (পারা: ৮, সূরা আনআম: ১৫৫)

নেকী এবং তাকওয়ার শিক্ষা

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব মানুষকে নেকী এবং তাকওয়া শেখানোর জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। সূরা জুমায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ
اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ
كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿٢﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তিনিই হন, যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেন যেন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করেন এবং নিশ্চয় তারা ইতোপূর্বে অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ছিলো।

(পারা: ২৮, সূরা জুমা: ২)

সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর মহান অনুগ্রহ হয়েছে মুসলমানদের উপর যে, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের উপর তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। (পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান: ১৬৪)

সূরা বাকারায় হযরত ইব্রাহিম عَلَیْهِ السَّلَام এর দোয়ায় এই বিষয়বস্তু এসেছে:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে প্রতিপালক আমাদের! এবং প্রেরণ করো তাদের মধ্যে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে তোমার কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। (পারাঃ ১, সূরা বাকারাঃ ১২৯)

এই আয়াতগুলো বলে যে, কুরআনের অবতীর্ণ হওয়া শুধু তথ্য প্রদানের জন্য নয় বরং মানুষের চরিত্র ও আচরণকে সুন্দর করার জন্য। 'তাযকিয়া'র অর্থ হলো মানুষকে মন্দ কাজ থেকে পবিত্র করা এবং নেক কাজে সজ্জিত করা। কুরআন মিথ্যা, চুরি, ধোঁকা, অত্যাচার, মন্দ ধারণা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকারের মতো সমস্ত চারিত্রিক মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ন্যায়, সু-ধারণা, জনকল্যাণ, ভালোবাসা ও বিনয়ের মতো নেক কাজের শিক্ষা দেয়। এই তাযকিয়া শুধু বাহ্যিক নয় বরং বাতেনীও, অর্থাৎ অন্তর ও রূহের পবিত্রতা। সমাজে যখন মানুষ কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে তখন তাদের মধ্যে উচ্চতর নৈতিকতা সৃষ্টি হয়, পারস্পরিক ভালোবাসা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ শান্তি ও প্রশান্তির আবাসস্থলে পরিণত হয়। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ صَالِحَ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। (মুসনাদে আহমদ, ৩/৩২৩, হাদীসঃ ৮৯৬১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যতার দলিল

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত এবং সত্যতার স্পষ্ট দলিল। সূরা আনকাবুতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং বললো; 'কেন অবতীণ হয় না কিছু নিদর্শন তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে?' আপনি বলুন; 'নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আমি তো এই স্পষ্ট সতর্ককারী হই এবং তাদের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের উপর পাঠ করা হচ্ছে? (পারাঃ ২১, সূরা আনকাবুতঃ ৫০- ৫১)

গুনাহ থেকে বের করার মাধ্যম

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব মানুষকে গুনাহ ও অন্ধকার থেকে বের করে নূর এবং নেক কাজের দিকে আনার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে।

সূরা ইব্রাহিমে ইরশাদ হয়েছে:

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার রাশি থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। (পারা: ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ১)

সূরা হাদীদেও ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذِیْ یُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ لِّیُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তিনিই হন, যিনি আপন বান্দার উপর সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান। (পারা: ২৭, সূরা হাদীদ: ৯)

এই আয়াতগুলো জানায় যে, কুরআন মানুষকে গুনাহ এবং পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান এবং আনুগত্যের নূরের দিকে নিয়ে যায়। যখন মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করে, এর বিধানাবলীর উপর আমল করে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করে তখন তার গুনাহ ক্ষমা হয়, তার অন্তর পবিত্র হয় এবং সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যায়। কুরআনে তাওবার উৎসাহ, গুনাহের ক্ষমার সুসংবাদ এবং নেক আমলের প্রতিদানের কথা বারবার এসেছে, যাতে মানুষ নিরাশ না হয় এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সমাজে যখন মানুষ কুরআন থেকে দূরে সরে যায় তখন তারা গুনাহে নিমজ্জিত হতে থাকে এবং হতাশা ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু কুরআনের দিকে ফিরে আসাতে তারা নতুন জীবন পায়।

আল্লাহর রহমত এবং বরকত

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব সমস্ত জাহানের জন্য রহমত এবং বরকত।

সূরা ইউনুসে ইরশাদ হয়েছে:

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ ۙ۬ وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۵۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মানবকুল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং অন্তরসমূহের বিশুদ্ধতা, হিদায়াত এবং রহমত ঈমানদারদের জন্য। (পারা: ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭)

সূরা বনী ইসরাঈলে ইরশাদ হয়েছে:

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۙ وَ لَا یَزِیْدُ الظّٰلِمِیْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি কুরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করি ঐ বস্তু, যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত; এবং এ থেকে যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

(পারা: ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮২)

এই আয়াতগুলো জানায় যে, কুরআন আল্লাহর রহমতের প্রকাশস্থল। এটি মানুষের জন্য

দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের মাধ্যম। যে লোকেরা কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে তাদের উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়, তাদের জীবনে বরকত আসে, তাদের সমস্যা সমাধান হয় এবং তাদের অন্তর শান্তি পায়। কুরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঘরে বরকত আসে, রোগ থেকে শিফা মিলে এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হয়। সমাজে যখন কুরআনের সম্মান করা হয়, এর তিলাওয়াত ও শিক্ষার আয়োজন করা হয় তখন পুরো সমাজের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনেঃ

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

অর্থাৎ যখন কোনো জাতি আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মধ্যে এর আলোচনা করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের ঢেকে নেয়, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। (মুসলিম, পৃষ্ঠাঃ ১১১০, হাদীসঃ ৬৮৫৩)

সংশোধন এবং শিক্ষা গ্রহণ

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া এবং তাদের নসিহত করার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এই কিতাব পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণনা করে শিক্ষা প্রদান করে। সূরা সোয়াদ এ ইরশাদ হয়েছেঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْۤا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এটা এক কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, বরকতময়; যাতে তারা সেটার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিবেকবান লোকেরা উপদেশ মান্য করে।

(পারাঃ ২৩, সূরা সোয়াদঃ আয়াতঃ ২৯)

কুরআনের এই দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি মানুষকে তার আসল বাস্তবতা, তার সৃষ্টিকর্তা, তার দায়িত্বসমূহ এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। মানুষ দুনিয়ার ব্যস্ততায় প্রায়ই এই মৌলিক প্রশ্নগুলো যে, আমি কোত্থেকে এসেছি, আমাকে কেন এখানে পাঠানো হয়েছে এবং আমার পরিণাম কী হবে; এর ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। কুরআন বারবার এই সত্যগুলোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই স্মরণ করিয়ে দেওয়া শুধু তথ্যের নয় বরং আমলী জিন্দেগীতে আল্লাহর স্মরণকে সতেজ রাখার জন্য। সমাজে যখন মানুষ নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যায় এবং বস্তুবাদে হারিয়ে যায় তখন কুরআনের এই উপদেশ তাদের আধ্যাত্মিক জাগরণের দিকে আহ্বান জানায়।

সূরা ইউসুফে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়, তাদের খবরাদি দ্বারা বিবেকবানদের চক্ষ খুলে যায়। এটা কোন বানোয়াট কথা নয়; কিন্তু নিজের পূর্ববর্তী বাণীগুলোর সত্যায়ন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণ আর মুসলমানদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (পারা: ১৩, সূরা ইউসুফ: ১১১)

সূরা হুদ-এ ইরশাদ হয়েছে:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সব কিছু আমি আপনাকে রাসূলগণের সংবাদই শুনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করবো।

(পারা: ১২, সূরা হুদ: ১২০)

কুরআনে করীমে হযরত নূহ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর ঘটনাবলী, আদ, সামুদ জাতি, ফেরাউন এবং অন্যান্য জালিম জাতিসমূহের পরিণাম এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এই জন্য করা হয়েছে যাতে আমরা শিক্ষা অর্জন করি। এই ঘটনাগুলো জানায় যে, যেসব জাতি আল্লাহর রাসূলদের অস্বীকার করেছে, অত্যাচার ও ফাসাদ ছড়িয়েছে এবং সংশোধনে অস্বীকার করেছে তাদের পরিণাম ছিল ধ্বংস; আর যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, নেক আমল করেছে এবং সবর করেছে আল্লাহ তাদের সফলতা দান করেছেন। এই ঐতিহাসিক সবক প্রতিটি যুগের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে যখন মানুষ ইতিহাস থেকে সবক শেখে না তখন তারা সেই ভুলগুলোই পুনরাবৃত্তি করে যা আগের লোকেরা করে গেছে, কিন্তু কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে আমরা সেই ভুলগুলো থেকে বাঁচতে পারি।

কুরআনে করীমের অবতীর্ণের এই উদ্দেশ্য ও হিকমতগুলো জানায় যে, এই কিতাব জীবনের প্রতিটি শাখার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গাইড। এতে আকিদা থেকে শুরু করে চরিত্র পর্যন্ত, ইবাদত থেকে শুরু করে লেনদেন পর্যন্ত, ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ব্যবস্থা পর্যন্ত এবং দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত প্রতিটি দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের দায়িত্ব হলো কুরআনের এই মহান হিকমত ও উদ্দেশ্যসমূহ বুঝা, এর তিলাওয়াতকে নিজের রুটিন বানানো, এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করা, এর বিধানাবলীর উপর আমল করা এবং নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে এর শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলা। যখন আমরা এমনটি করব তখন দুনিয়াতেও সফলতা ও প্রশান্তি অর্জিত হবে এবং আখিরাতেও চিরস্থায়ী মুক্তি নসীব হবে। আল্লাহ পাক আমাদের কুরআন বুঝার, এর উপর আমল করার এবং এর আলোতে জীবন অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মন লাগাবেন না

মাওলানা আবু রজব মুহাম্মদ আসিফ আত্তারী মাদানী

عَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِيَ اللّٰهُ وَاَحَبَّنِيَ النَّاسُ. فَقَالَ : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ. وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ.

অনুবাদ: হযরত আবু আব্বাস সাহল বিন সাদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন যে, এক ব্যক্তি নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা আমি করলে আল্লাহ পাক আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও ভালোবাসবে। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী হও তবে আল্লাহ পাক তোমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষের নিকট যা কিছু আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী হও তবে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে। (শুআবুল ঈমান, ৭/৩৪৪, হাদীস: ১০৫২৩)

এই হাদীসে পাকে মৌলিকভাবে দুটি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে: (১) উপস্থিত ব্যক্তির প্রশ্ন যে, একটি আমলের মাধ্যমেই যেন স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ই আমাকে ভালোবাসে। (২) হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য 'যুহদ' এর আমল ইরশাদ করা যে, এটি সেই আমল যার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাক ও মানুষ উভয়ই তোমাকে ভালোবাসবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা

এই হাদীসে পাকের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করা যেতে পারে: যেমন; ✯ মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার দাবী করা কেমন? ✯ যুহদ-এর গুরুত্ব ও ফযীলত, ✯ যুহদ-এর সংজ্ঞা, ✯ যুহদ-এর দাবী সত্য নাকি মিথ্যা তা কীভাবে বোঝা যাবে? ✯ আল্লাহ পাকের তাঁর বান্দাকে ভালোবাসার অর্থ, ✯ যুহদ অবলম্বনকারীকে আল্লাহ পাক কেন ভালোবাসেন? ✯ আল্লাহ

পাকের নিকট দুনিয়ার মর্যাদা কী? ✯ কোন দুনিয়া নিন্দনীয়? ✯ যুহদ অবলম্বনকারীকে মানুষ কেন ভালোবাসে? ✯ মানুষের সম্পদের প্রতি আগ্রহ রাখার অপকারিতা এবং অন্যান্য। জলীলুল কদর ব্যাখ্যাকারকগণ এই প্রসঙ্গে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার সারাংশ ও নির্যাস লক্ষ্য করুন:

মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

আগত ব্যক্তির প্রশ্নে এটিও ছিল যে, মানুষও যেন আমাকে ভালোবাসে। যদি এই আকাঙ্ক্ষা নিষিদ্ধ হতো তবে হুযুর নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগত ব্যক্তিকে সংশোধন করে দিতেন। অতএব নিয়ত ভালো হলে এই আকাঙ্ক্ষায় কোনো অসুবিধা নেই, কারণ সৃষ্টির ভালোবাসা স্রষ্টার ভালোবাসারই নিদর্শন। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করেছিলেন:

(وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমার সত্য-প্রসিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত রাখো পরবর্তীদের মধ্যে।

(পারা: ১৯, সূরা শুআরা: ৮৪)

খাযাইনুল ইরফানে রয়েছে: অর্থাৎ ঐ উম্মতদের মধ্যে যারা আমার পরে আসবে। যেমনটি আল্লাহ পাক তাঁকে এটি দান করেছেন যে, সমস্ত ধর্মের অনুসারীরা তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

যুহদ-এর গুরুত্ব ও ফযীলত

বান্দার জন্য সবচেয়ে উচ্চ ও মহান উদ্দেশ্য হলো; সে যেন তার খালিক ও মালিকের প্রিয় হয়ে যায়। আল্লাহ পাকের ভালোবাসা প্রতিটি কামনার শেষ সীমা এবং প্রতিটি আকাঙ্ক্ষার গন্তব্য। ইমাম আহমদ 'কিতাবুয যুহদ'-এ এবং ইমাম বায়হাকী হযরত তাউস থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন:

اَلزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ.
وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُطِيلُ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ

অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ মন ও শরীরকে আরাম দেয় এবং দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ দুঃখ ও পেরেশানীকে বাড়িয়ে দেয়।

(আয যুহদ লি আহমদ, পৃষ্ঠা: ৩৫, হাদীস: ৫১)

ইমাম শরফুদ্দীন তীবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যুহদের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের ভালোবাসা অর্জিত হওয়া এই বিষয়ের দলিল যে, যুহদ অত্যন্ত উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ আমল, কারণ একে আল্লাহ পাকের ভালোবাসার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দুনিয়ার ভালোবাসা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ। (শরহুত তীবী, ৯/৩৫১, ৫১৮৭নং হাদীসের পাদটিকা)

مرا دل پاک ہو سرکار! دنیا کی محبت سے
مجھے ہو جائے نفرت کاش! آقا مال و دولت سے

মেরা দিল পাক হো সরকার! দুনিয়া কি মুহাব্বত সে
মুঝে হো জায়ে নফরত কাশ! আকা মাল ও দৌলত সে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৪০৮)

যুহদ কাকে বলে?

আভিধানিক অর্থ: اَلْاِعْرَاضُ عَنِ الشَّيْءِ اِحْتِقَاراً কোনো কিছুকে তুচ্ছ মনে করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

শরয়ী অর্থ: اَلْاِقْتِصَارُ عَلٰى قَدْرِ الضَّرُوْرَةِ مِمَّا يَتَيَقَّنُ حِلَّهٗ হালাল হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস রেখে শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

(ফয়যুল ক্বদীর, ১/৬১৫, ৯৬০নং হাদীসের পাদটীকা)

একটি হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে যা তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণনা করেছেন; হুযুর নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যুহদ মানে হালালকে হারাম করা এবং সম্পদ নষ্ট করার নাম নয়; বরং দুনিয়া থেকে অনাগ্রহ হলো; তোমার নিজের হাতের জিনিসের চেয়ে আল্লাহ পাকের নিকট যা আছে তার উপর বেশি ভরসা থাকা এবং বিপদের সময় প্রাপ্ত সাওয়াবের প্রতি আগ্রহ ওই নিয়ামতটি তোমার নিকট অবশিষ্ট থাকার চেয়েও বেশি হওয়া। (তিরমিযী, ৪/১৫২, হাদীস: ২৩৪৭)

দুনিয়ার উপর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যুহদ অবলম্বন করা

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যুহদ হলো; মানুষ দুনিয়ার উপর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আখিরাতের জন্য দুনিয়া থেকে মন সরিয়ে নেওয়া; তা জাহান্নামের ভয়ে হোক বা জান্নাতের লালসায় হোক অথবা আল্লাহ পাক ব্যতীত প্রত্যেক কিছু থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার কারণে হোক। আর এই অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত তৈরি হয় না যতক্ষণ না বক্ষ বিশ্বাসের নূরে উন্মোচিত হয়। আর ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যুহদের কল্পনা করা যায় না, যার কাছে সম্পদও নেই আবার মর্যাদাও নেই।

(মিরকাত, ৯/৪১, ৫১৮৭নং হাদীসের পাদটীকা)

আমি কোন জিনিসের উপর যুহদ করেছি?

হযরত ইবনে মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে কেউ ডাকল: "হে যাহিদ!" তখন তিনি বললেন: আসল যাহিদ তো ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ, যাঁর কাছে দুনিয়া নিজে হেঁটে এসেছিল এবং তিনি তা ত্যাগ করেছেন; আর আমি কোন জিনিসের উপর যুহদ করেছি (যে, তোমরা আমাকে যাহিদ ডাকছ)?

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন: এটি পূর্ণাঙ্গ যুহদের ব্যাখ্যা; নতুবা যুহদের আসল হাকীকত হলো, কোনো জিনিসের প্রতি প্রবণতা না থাকার নাম। আর হাকীকতে এই অবস্থা আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ আকর্ষণ ব্যতীত অর্জিত হয় না, যা অন্বেষণকারীকে নশ্বর জিনিস থেকে সরিয়ে অবশিষ্ট অবিনশ্বর অবস্থায় লিপ্ত করে দেয়।

(মিরকাত, ৯/৪১, ৫১৮৭নং হাদীসের পাদটীকা)

যুহদের দাবি সত্য নাকি মিথ্যা হওয়ার দলিল

মিরকাতুল মাফাতীহ-এ রয়েছে: নফস যুহদের দাবী করে, তবে তার সত্যতা বা মিথ্যা তখনই প্রকাশ পায়, যখন দুনিয়া সহজলভ্য হয় এবং তার উপর ক্ষমতা অর্জিত হয়; আর দুনিয়া না থাকার অবস্থায় বিষয়টি দুই সম্ভাবনার মাঝে থাকে এবং আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

(মিরকাত, ৯/৪১, ৫১৮৭নং হাদীসের পাদটীকা)

যুহদের ফলাফল

যুহদের ফলাফল হলো দুনিয়ার প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসে তুষ্ট থাকা। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; ততটুকু খাবার যা দ্বারা ক্ষুধা মেটে, এমন পোশাক যা দ্বারা সতর ঢাকা যায়

এবং এমন ঘর যা তাকে শীত ও গরম থেকে রক্ষা করে এবং ততটুকু আসবাবপত্র যা তার প্রয়োজন হয়। (মিরকাত, ৯/৪১, ৫১৮৭নং হাদীসের পাদটীকা)

বুদ্ধিমান কে?

যুহদ অবলম্বনকারীরাই বুদ্ধিমান লোক; কারণ তারা ঐ জিনিসকেই ভালোবেসেছে যাকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন এবং ঐ জিনিসকেই অপছন্দ করেছে যাকে আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন অর্থাৎ দুনিয়া জমা করাকে; এবং তারা নিজেদের নফসকে শান্তিতে রেখেছে। ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি আমাকে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসিয়ত করতে হয়, তবে আমি যাহিদদের জন্য করব। (আরবাঈন লিন-নববী, পৃষ্ঠা: ১০৭, ৩১নং হাদীসের পাদটীকা)

বড় যাহিদ কে?

বায়হাকী হযরত দাহহাক থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি দরবারে নববী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ উপস্থিত হয়ে আরয করল: সবচেয়ে বড় যাহিদ কে? ইরশাদ করলেন: সবচেয়ে বড় যাহিদ সেই ব্যক্তি, যে কবর এবং পঁচে-গলে যাওয়াকে ভুলে যায় না, দুনিয়ার সর্বোত্তম সাজসজ্জা ত্যাগ করে, অবশিষ্ট থাকা জিনিসকে নশ্বর জিনিসের উপর প্রাধান্য দেয়, আগামীকালকে নিজের দিনসমূহের মধ্যে গণ্য করে না এবং নিজেকে মৃতদের কাতারে গণ্য করে। (শুআবুল ঈমান, ৭/৩৫৫, হাদীস: ১০৫৬৫)

نبی کے نور کا صدقہ خدایا جگمگا دینا
کرم! یارب! اندھیرا قبر کا مجھ کو ڈراتا ہے

নবী কে নূর কা সদকা খোদায়া জগমগা দেনা
করম! ইয়া রব! আন্ধেরা কবর কা মুঝকো ডারাতা হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৪৪২)

সুফিদের নিকট যুহদের সারাংশ

সুফিদের নিকট যুহদের অর্থ হলো; চেষ্টার মাধ্যমে কোনো জিনিসের আগ্রহ মন থেকে সরিয়ে দেওয়া। আর এর তিনটি স্তর রয়েছে; প্রথমত: সন্দেহজনক বিষয় থেকে যুহদ, আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য। দ্বিতীয়ত: প্রয়োজন অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়া থেকে যুহদ, যাতে মুরাকাবায় লিপ্ত হয়ে সময়ের সঠিক ব্যবহার করা যায়। তৃতীয়ত: তুমি নিজের যুহদকে রবের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে কোনো গুরুত্ব দিও না এবং তোমার নিকট যুহদ থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান হয়ে যাওয়া।

(মিরকাত, ৯/৪১, ৫১৮৭নং হাদীসের পাদটীকা)

আল্লাহ পাক তোমাকে ভালোবাসবেন

যখন বান্দা যুহদ অবলম্বন করবে তখন আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসবেন। কারণ বান্দা ঐ জিনিস থেকে বিমুখ হয়েছে, যা থেকে আল্লাহ পাক বিমুখ হয়েছেন এবং যার প্রতি তিনি দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কখনো রহমতের দৃষ্টি দেননি (যেমনটি হাদীসে এসেছে) আর এই বিষয়টি বুঝানো হয়েছে যে, যদি তুমি দুনিয়াকে ভালোবাসো তবে আল্লাহ পাক তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন; কারণ তাঁর ভালোবাসা দুনিয়ার ভালোবাসা না থাকার সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া এই জন্যও যে, আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসেন, যে তাঁর আনুগত্য করে। আর আল্লাহ পাকের

ভালোবাসা ও দুনিয়ার ভালোবাসা একত্রে জমা হতে পারে না; কারণ অন্তর হলো আল্লাহ পাকের ঘর এবং তিনি পছন্দ করেন না যে, তাঁর ঘরে অন্য কাউকে শরিক করা হোক আর আল্লাহ পাকের ভালোবাসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; সাওয়াব দান করা। (ফয়যুল ক্বদীর, ১/৬১৫, ৯৬০নং হাদীসের পাদটীকা)

محبت میں اپنی گُما یا الٰہی
نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الٰہی
رہوں مست و بے خود میں تیری وِلا میں
پِلا جام ایسا پِلا یا الٰہی

মুহাব্বত মেঁ আপনি গুমা ইয়া ইলাহী
না পাও মেঁ আপনা পাতা ইয়া ইলাহী
রাহুঁ মাস্ত ও বে-খুদ মেঁ তেরি ওয়িলা মেঁ
পিলা জাম এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১০৮)

অতঃপর যে দুনিয়ার নিন্দা করা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়া। আর প্রয়োজন অনুযায়ী দুনিয়া অন্বেষণ করা তো ওয়াজিব। কিছু আলিম বলেছেন: প্রয়োজন অনুযায়ী অর্জন করা দুনিয়ার মধ্যেই গণ্য হয় না; আসল দুনিয়া হলো যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এর উপর আল্লাহ পাকের এই বাণী দলিল:

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে এসব প্রবৃত্তির মায়া-মুহাব্বত নারীগণ, সন্তান-সন্ততি। (পারা: ৩, আলে ইমরান: ১৪)

এই আয়াতটি প্রাচুর্য এবং বিলাসীতার দিকে ইশারা করে।

(আরবাঈন লিন-নববী, পৃষ্ঠা: ১০৮, ৩১নং হাদীসের পাদটীকা)

দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসার প্রশংসনীয় রূপ

ধন-সম্পদ ও দুনিয়ার এমন ভালোবাসা নিন্দনীয়, যা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য হয়; কারণ এমন ভালোবাসা মানুষকে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়। তবে জনকল্যাণমূলক কাজ করা, অভাবীর প্রয়োজন মেটানো, মজলুমের সাহায্য করা, দুস্থকে অন্ন দেওয়ার জন্য সম্পদের ভালোবাসা ইবাদত। (দালীলুল ফালিহীন, ২/৪০২, ৪৭১নং হাদীসের পাদটীকা) কিন্তু এটিও খেয়াল রাখা দরকার যে, যদি কোনো ব্যক্তি মানুষের উপর গর্ব, অহংকার এবং মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য দুনিয়া প্রাপ্তিতে খুশি হয় তবে তা নিন্দনীয়; আর যদি আল্লাহ পাকের দয়া বা অনুগ্রহের উপর কৃতজ্ঞতা হিসেবে খুশি হয়, তবে তা প্রশংসনীয়।

(আরবাঈন লিন-নববী, পৃষ্ঠা: ১০৯, ৩১নং হাদীসের পাদটীকা)

আল্লাহ পাক আর কার কার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করেন?

আল্লাহ পাক এমন লোকদের ভালোবাসেন যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে তাদের কথা এসেছে: ঈমান, তাকওয়া, ধৈর্য, নেকী, ন্যায়বিচার, পবিত্রতা, তাওবা এবং তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারীদের।

মানুষের কাছে যা আছে তা থেকে অনাগ্রহী থাকো

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহের পাশাপাশি মানুষের কাছে যা আছে তা থেকেও অনাগ্রহী থাকার কথা ইরশাদ করেছেন অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদা।

(মিরকাত, ৯/৪০, ৫১৮৭নং হাদীসের পাদটীকা)

যখন মানুষ এটি করবে তখন সে এই পুরস্কার পাবে যে, মানুষ তাকে ভালোবাসবে; কারণ মানুষের অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা প্রাকৃতিকভাবে রাখা হয়েছে এবং এই ভালোবাসা তাদের অন্তরে গেঁথে গেছে। সুতরাং যে কেউ মানুষের সাথে তার প্রিয় বস্তুর বিষয়ে ঝগড়া করে তখন মানুষ তাকে ঘৃণা করে এবং তাকে ত্যাগ করে। আর যে কেউ মানুষের প্রিয় বস্তুর বিষয়ে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, মানুষ তাকে ভালোবাসে এবং তাকে সম্মান দেয়। এজন্যই প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য মানুষের সম্মান করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাদের দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয়; যখন সে তাদের দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তখন তারা তাকে ঘৃণা করে এবং তার কথাকেও অপছন্দ করে।" বর্ণিত আছে যে, বসরাবাসীর কারো নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো; তোমাদের নেতা কে? সে উত্তর দিল: হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। প্রশ্নকারী বলল: তোমাদের নিকট তাঁর এই স্থান ও মর্যাদা কেন? সে বলল: আমরা তাঁর ইলম থেকে দলিল গ্রহণ করি এবং তিনি আমাদের দুনিয়া থেকে অমুখাপেক্ষী।

(ফয়যুল ক্বদীর, ১/৬১৫, ৯৬০নং হাদীসের পাদটিকা)

ভাববার বিষয়

বর্তমান সময়ের পরিবেশ এমন যে, দুনিয়া এবং সম্পদ ও মর্যাদার ভালোবাসা মাথা চাড়া দিয়েছে। যাকে দেখবেন সেই দুনিয়ার উন্নতির জন্য সচেষ্ট এবং সম্পদের লোভে লিপ্ত। এমন অবস্থায় যুহদ অবলম্বন করার চিন্তাকে পুরনো বা মান্ধাতা আমলের বলা হয়; অথচ যুহদ জান্নাতের রাস্তায় নিয়ে যায়। যুহদ দ্বারা আল্লাহ পাকের ভালোবাসা অর্জিত হয় এবং মানুষও এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসে। কিন্তু আফসোস! আমাদের এখানে সবকিছু উল্টো হচ্ছে। ফয়সালা আমাদের হাতে যে, যুহদ অবলম্বন করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রিয় হয়ে যাব, নাকি দুনিয়া ও সম্পদের ভালোবাসায় লিপ্ত হয়ে থেকে যাব।

আগুনের শিখা

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টিতে শুধু শরীর ও প্রাণই নয় বরং অন্তরের অবস্থাও বদলে যেত, যেমনটি হযরত শায়বা বিন উসমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বড়ই ঈমানোদ্দীপক ঘটনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর চাচা এবং পিতা উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং হযরত আলী ও হযরত হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا তাদের হত্যা করেছিলেন। যখন গাযওয়ায়ে হুনাইনের সময় হলো, তখন পর্যন্ত শায়বা বিন উসমান মুসলমান হননি। তিনি বলেন যে, গাযওয়ায়ে হুনাইনের দিন আমার চাচা এবং পিতার কথা মনে পড়ে গেল। আমি মনে মনে বললাম যে, আজ আমি মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর থেকে প্রতিশোধ নেব। আমি নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে এলাম তো ডান পাশে হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছিলেন, আমি ভাবলাম যে, তিনি হযরত মুহাম্মদকে অসহায় ছাড়বেন না। বাম দিক থেকে কাছে এলাম তো হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারিস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দেখলাম, ভাবলাম যে, তিনিও তাঁকে একা ছাড়বেন না। এরপর আমি পেছন দিক থেকে কাছে এলাম এমনকি তলোয়ার চালাবোই ঠিক এমন সময় হঠাৎ আগুনের একটি শিখা বিদ্যুতের ন্যায় আমার সামনে উত্থিত হলো। আমি এই ভয়ে নিজের হাত চোখের উপর রেখে উল্টো পায়ে পেছনে সরে এলাম যে, এই শিখা আমাকে জ্বালিয়ে ছাই না করে দেয়। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ডাকলেন: হে শায়বা! এরপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হাত আমার বুকের উপর রাখলেন এবং দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! এর অন্তর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও। এরপর যখন আমি দৃষ্টি তুলে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে তাকালাম তো তিনি আমার নিকট

আমার কান, চোখ বরং প্রতিটি জিনিসের চেয়ে বেশি প্রিয় মনে হতে লাগলেন (একটি উক্তি এটিও যে, আল্লাহ পাক তাঁর অন্তরে ইসলামের ভালোবাসা ও সত্যতা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন, সুতরাং তিনি ঐ দিনই ইসলাম গ্রহণ করেন)। হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন যে, হে শায়বা! কাফেরদের সাথে লড়াই করো! তখন আমি হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। আল্লাহর শপথ! ঐ সময় নিজের প্রাণ বাজি রেখে প্রতিটি বিপদ থেকে হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হেফাযত করা আমার নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়ে গেল। (দেখুন: আল-ইস্তিআব ফি মা'রেফাতিল আসহাব, ২/২৬৯; তারিখে ইবনে আসাকির, ২৩/২৫৬ থেকে ২৫৮)

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রাণঘাতী আক্রমণের ঠিক ঐ মুহূর্তে হঠাৎ আগুনের শিখা প্রকাশ পাওয়া এবং এরপর মোবারক হাত ও দোয়ায়ে নববীর মাধ্যমে চিরশত্রুর অন্তরের অবস্থা বদলে যাওয়া নিশ্চয়ই হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযানা শান। এই ঘটনা থেকে কিছু কথা শেখার আছে:

সাহাবায়ে কিরাম হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকারের ভালোবাসা পোষণকারী, প্রাণ উৎসর্গকারী এবং রক্ষক ছিলেন, এই বিষয়টি কাফেরদের কাছেও স্বীকৃত ছিল।

দোয়ায়ে নববী দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আল্লাহ পাকের দান করা ইলমে গায়ব অর্জিত ছিল।

তাঁর হাত মুবারক এবং পবিত্র যবানে এমন বরকত ছিল যে, আল্লাহর অনুগ্রহে অন্তরের অবস্থা বদলে যেত, ঈমান নসীব হতো; যেন তিনি অসুস্থ অন্তরের চিকিৎসক ছিলেন।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তা আপাদমস্তক রহমত, যা শত্রুকেও কল্যাণ ও হেদায়েত দান করে।

শত্রুর সাথেও নম্রতা ও কল্যাণের ব্যবহার করা উচিত, কেননা এটি হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যুদ্ধের ময়দানেও আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা এবং প্রশান্তির সহিত থাকতেন।

কোনো বাহ্যিক কারণ ছাড়াই আগুনের শিখা প্রকাশ পাওয়া আল্লাহর ওলীদের আল্লাহ পাকের গায়বি সাহায্য অর্জিত হওয়ার প্রমাণ।

কারো বর্তমান অবস্থা দেখে তার ভবিষ্যতের ফয়সালা বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত মতামত কায়েম করা যায় না।

শত্রু যখন বন্ধু হয়ে যায় তখন তার উপর ভরসা ও বিশ্বাস করা উচিত।

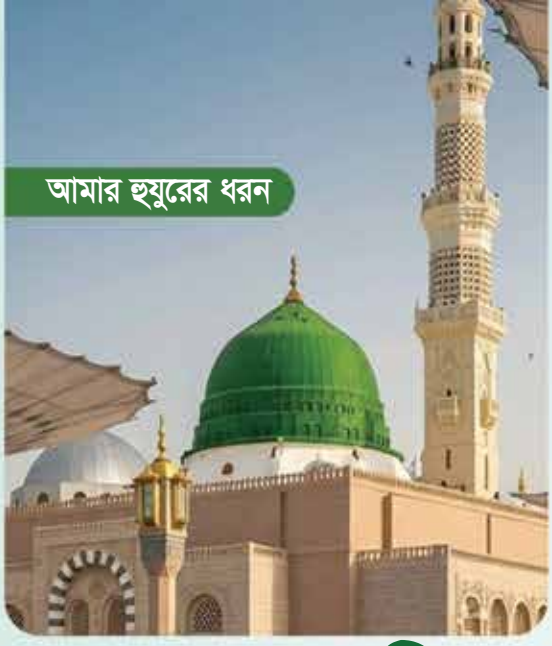

সর্বশেষ নবী
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
মুহাম্মদে আরবী
(পর্ব: ০১)
মুচকি হাসির ধরণ

মাওলানা নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন শান দান করেছেন যে তাঁর প্রতিটি আচরণ শরীয়তের হুকুমের মর্যাদা লাভ করেছে। এছাড়াও আল্লাহ পাক, হাদীসে রাসূল, উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে হাদীসে রাসূল শুধুমাত্র যবান দিয়ে বলা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনের পুরো বিবরণ হাদীস হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এই দিকটি চিন্তা করলে প্রতিটি সাহাবীর চোখের উপর কুরবান হতে মন চাইবে যে, দীদারে মুস্তফার বরকতে এই মহান ব্যক্তিবর্গ এমন মর্যাদা লাভ করেছেন, যেই পর্যন্ত এখন আর কেউ কখনো পৌঁছাতে পারবে না।

کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں
ہمیشہ نقش رہے رُوئے یار آنکھوں میں
انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں
کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں

কুছ এ্যায়সা করদে মেরে কিরদেগার আঁখোঁ মে
হামেশা নকশ রহে রুয়ে ইয়ার আঁখোঁ মে
উনহে না দেখা তো কিস কাম কি হে ইয়ে আঁখে
কে দেখনে কি হে সারি বাহার আঁখো মে

(সামানে বখশিশ, পৃ: ১৪৫)

মুস্তফার অভ্যাস: মুচকি হাসি আমাদের আকা করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম অভ্যাস ছিল। (মিরআতুল মানাজিহ, ৭/১৪)। যে ব্যক্তিবর্গ তাঁর মুবারক মুচকি হাসি দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরা সেই দৃশ্যের প্রশান্তিকে মন ও মননে সংরক্ষিত করেছেন। যেমন; (১) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেন, হযরত হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا উপস্থিত হলেন, তখন সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাদা পশমী কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় সবুজ রেশমী বিছানায় আরাম করছিলেন। হযরত হালিমা আলতো করে বুক মুবারকের উপর হাত রাখলেন, প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসলেন এবং মুবারক চোখ খুললেন, যা থেকে একটি নূর বের হয়ে আকাশের উচ্চ শিখর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃ: ১৯০) (২) হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে

যখনই দেখতেন তখন মুচকি হাসতেন। (বুখারী, ২/৩২০, হাদীস: ৩০৩৫) (৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন জাযআ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।

(তিরমিযী, ৫/৩৬৬, হাদীস: ৩৬৬১)

جس کی تسکیں سے روتے ہوئے ہنس پڑیں
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام

জিসকি তাসকীন সে রোতে হুয়ে হঁস পড়ে
উস তাবাসসুম কি আদত পে লাখোঁ সালাম

হাসির ধরণ: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন: আমি কখনো নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবে খিলখিল করে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর তালুর অংশ দেখা যায়। তিনি শুধুমাত্র মুচকি হাসতেন। (বুখারী, ৪/১২৫, হাদীস: ৬০৯২)

সর্বশেষ নবী কখন কখন মুচকি হেসেছেন?

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের আচরণের মাধ্যমে আমাদের চেহারা দ্বারা খুশি প্রকাশ করা শিখিয়েছেন এবং এটিও শিখিয়েছেন যে, এই প্রকাশ কখন কখন করতে হবে? আসুন! কয়েকটি ঘটনা নির্বাচিত শিরোনামের অধীনে বুঝি:

(১) আল্লাহ পাকের মহিমা ও অনুগ্রহের বর্ণনায় মুচকি হাসি

আল্লাহ পাকের দয়াময় মহিমা মন ও মননে বসে গেলে শরীয়তের বিধানাবলীর উপর আমল করা খুব সহজ হয়ে যায়। সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আল্লাহ পাকের দয়াময় শান মানসিকতায় বসিয়ে দেওয়ার ধরণটি দেখুন। যেমনটি এক উপলক্ষে তিনি ইরশাদ করেছেন: নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নাম থেকে বের হওয়া সর্বশেষ ব্যক্তিকে চিনি এবং জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তিকেও চিনি। এক বান্দা জাহান্নাম থেকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হবে, আল্লাহ পাক তাকে ইরশাদ করবেন: যাও! জান্নাতে চলে যাও। অতএব সে জান্নাতে গিয়ে এই খেয়াল করবে যে, তা তো পূর্ণ হয়ে আছে, অতএব সে ফিরে এসে আরয করবে: হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তা পূর্ণ পেয়েছি! আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: যাও! জান্নাতে চলে যাও। অতএব সে জান্নাতে গিয়ে পুনরায় এই খেয়াল করবে যে, তা তো পূর্ণ হয়ে আছে, অতএব সে (আল্লাহ পাকের সাথে মুনাজাত করার স্থানে) ফিরে এসে আরয করবে: হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তা পূর্ণ পেয়েছি! আল্লাহ পাক তাকে ইরশাদ করবেন: যাও! জান্নাতে চলে যাও, তোমার জন্য দুনিয়ার সমান বরং তার চেয়ে দশ গুণ (বেশি জায়গা) রয়েছে। সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সে (অত্যধিক খুশি হয়ে) বলবে: আপনি বাদশাহ হয়েও পরিহাস করছেন? এটি বলে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এতটুকু মুচকি হাসলেন যে, তাঁর মুবারক দাঁত প্রকাশ পেয়ে গেল। (মুসলিম, পৃ: ৯৯, হাদীস: ৪৬১। আদ দীবায আলাল মুসলিম, ১/২৪৩। দালীলুল ফালিহীন, ৮/৭৩৫)

আসুন! মুস্তফা করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই ধরণকে আমরাও আপন করে নিই, মুচকি

হাসির সাথে নিজের কথাবার্তায় প্রতিপালকের নেয়ামত ও রহমতের চর্চা করি তবে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠবে এবং হতাশার অন্ধকার দূর হবে। اِنْ شَآءَ الله

(২) ভয়ের অবস্থা দূর হয়ে যাওয়ায় মুচকি হাসি

রিসালাতের দরবারে এক ব্যক্তি এলো এবং আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কোন জিনিস তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে আরয করল: আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কাছে কি কোনো গোলাম আছে, যাকে তুমি কাফফারা হিসেবে আযাদ করে দেবে? সে আরয করল: না। তিনি ইরশাদ করলেন: তুমি কি লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে আরয করল: না। তিনি আরেকটি প্রশ্ন করলেন: তুমি কি ষাট জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে পারবে? সে আরয করল: না। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, ইতিমধ্যে তাঁর দরবারে খেজুরের একটি ঝুড়ি পেশ করা হলো। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, ঐ ব্যক্তি কোথায়? সে আরয করল: আমি উপস্থিত আছি। তিনি তাকে ইরশাদ করলেন: এই ঝুড়িটি নাও এবং এর খেজুরগুলো সদকা করে দাও। সে আরয করল: আমার চেয়ে বেশি অভাবী কি আর কেউ হবে? আল্লাহ পাকের শপথ! এই জমিনের দুই প্রান্তের (তার উদ্দেশ্য ছিল মদীনা মুনাওয়ারার এক প্রান্ত) মাঝে কোনো ঘরের লোক আমার ঘরের লোকের চেয়ে বেশি অভাবী নয়। (তার এই কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতটুকু মুচকি হাসলেন যে, তাঁর সামনের ধারালো দাঁত প্রকাশ পেয়ে গেল। এরপর তিনি ইরশাদ করলেন: (যাও) এটি তোমার ঘরের লোকদের খাইয়ে দাও। (বুখারী, ১/৬৩৮, হাদীস: ১৯৩৬) (মনে রাখবেন! এভাবে কাফফারা আদায় ঐ সাহাবীর জন্য হুযুরের বিশেষ ক্ষমতা ছিল এবং এই হুকুম শুধুমাত্র ঐ সাহাবীর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল)

ہو اگر شانِ تبسم کا کرم
صبح ہو جائے شبِ دیجورِ غم

হো আগর শানে তাবাসসুম কা করম
সুবহ হো জায়ে শবে দীজুরে গম

(যওকে নাত, পৃ: ২৯৮)

চিন্তা করে দেখুন যে, যখন এই ব্যক্তি রিসালাতের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল তখন সে কতটা আতঙ্কিত ছিল, হুযুরের দরবারে সবকিছু বলে দিল, মনের আশা পূর্ণ হলো বরং মুস্তফার মুচকি হাসির মাধ্যমে মুস্তফার সন্তুষ্টির নেয়ামতও নসীব হলো। তো আমরাও কি এই অঙ্গীকার করব না যে, বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের বিপদ দূর করার জন্য প্রস্তুত থাকব এবং মুচকি হাসির মাধ্যমে তাদের অস্থির দিলকে প্রশান্তি দেওয়ার ব্যবস্থাও করব।

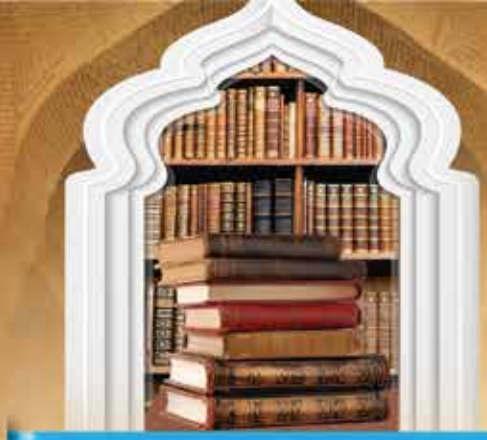

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

(১) আমল না থাকা সত্ত্বেও অন্যদের নেকীর দাওয়াত দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আজকাল এই বাক্যটি বলা হয় যে, "আমরা তো নিজেরা গুনাহগার, অন্যদের কী নেকীর দাওয়াত দেব।" এই বাক্যটির বাস্তবতা কী? সে সম্পর্কে আমার নির্দেশনা প্রয়োজন ছিল। অন্যদের নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য কি নিজের আমলদার হওয়া জরুরী? নাকি নিজের আমলে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও অন্যদের নেকীর দাওয়াত দেওয়া যাবে? বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি। এই মহান গুণের কারণেই সৃষ্টিকর্তা এই উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং যেভাবে প্রতিটি মুসলমানের জন্য নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো জরুরী, ঠিক তেমনি নিজের পরিবারের লোকজনকে এবং অন্য মুসলমানদেরও সামর্থ্য ও তৌফিক অনুযায়ী কৌশলে গুনাহ থেকে বিরত রাখা আবশ্যক। এছাড়া নিজের আমলে ত্রুটি থাকা যদিও সঠিক নয়, কেননা এটিও আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ, কিন্তু এই ত্রুটির কারণে অন্যদের নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কারণ নিজে নেক কাজ করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা একটি ওয়াজিব, আর অন্যদের সামর্থ্য অনুযায়ী গুনাহ থেকে বিরত রাখা দ্বিতীয় ওয়াজিব। যদি একটি ওয়াজিবের উপর আমল না থাকে, তবে উচিত হলো সেই ঘাটতি পূরণ করা, নাকি অপরাধের উপর আরও অপরাধ করে দ্বিতীয় ওয়াজিবকেও ছেড়ে দেওয়া। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যটি যে, "আমরা তো নিজেরা গুনাহগার, অন্যদের কী নেকীর দাওয়াত দেব" এটি সঠিক নয়। আমাদের উপর আবশ্যক যে, পবিত্র শরীয়তের উপর চলে নিজেরাও গুনাহ থেকে বাঁচব এবং অন্যদেরও সামর্থ্য অনুযায়ী কৌশলে বাঁচাব।

নোট: এমন জায়গা যেখানে প্রবল ধারণা হয় যে, সম্মুখস্ত ব্যক্তি মানবে না অথবা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে, সেখানে নেকীর দাওয়াত

দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা আবশ্যক নয়।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) সালামের সাওয়াব সালামের উত্তরের সাওয়াবের চেয়ে বেশি হওয়ার হিকমত

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, সালাম প্রদানকারী বেশি নেকী পায়, অথচ সালামের উত্তর প্রদানকারী কম। যদিও সালাম দেওয়া সুন্নাত এবং উত্তর দেওয়া ওয়াজিব, আর ওয়াজিবের সাওয়াব সুন্নাতের চেয়ে বেশি হয়। কিন্তু এখানে সুন্নাতের সাওয়াব ওয়াজিবের চেয়ে বেশি। এর কারণ কী?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরয়ী মূলনীতি এটাই যে, ওয়াজিব হওয়ার কারণে ওয়াজিবের সাওয়াব সুন্নাতের চেয়ে বেশি হয়, যার ফলে কোনো সুন্নাতি আমল শুধুমাত্র সুন্নাত হওয়ার কারণে ওয়াজিবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। ওয়াজিব নিজের হাকীকত এবং শরয়ী স্তরবিন্যাস অনুযায়ী সবসময় সুন্নাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রগণ্য থাকবে। তবে মাঝেমধ্যে এমন হয় যে, নিম্ন স্তরের আমলের (যেমন; সুন্নাত ও নফল) ক্ষেত্রে এমন কিছু ফযীলত, কারণ বা অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যেগুলোর কারণে এর সাওয়াব উচ্চ স্তরের আমলের (ফরয ও ওয়াজিব) চেয়ে বেড়ে যায়; কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্ব ঐ বিশেষ বাহ্যিক কারণের জন্য হয়, সুন্নাত বা নফল হওয়ার কারণে নয়। সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়া এবং উত্তর দেওয়া উভয়ই মুসলমান ভাইয়ের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম; কিন্তু যেহেতু সালাম প্রদানকারী এই নেক কাজে প্রথম উদ্যোগ নেয়, এই কারণে সে বেশি সাওয়াব লাভ করে। কেননা হাদীসে পাক অনুযায়ী নেক কাজে অগ্রগামী হওয়া উত্তর দেওয়ার পদক্ষেপের চেয়ে বহু গুণ শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হয়ে থাকে।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) একজন শরয়ী ফকিরকে একের অধিক শপথের কাফফারা দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলায় কী বলেন যে, শপথের কাফফারায় একজন শরয়ী ফকিরকে একদিনে একসাথে একটি সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ দেওয়া যেতে পারে, এর বেশি দেওয়া সঠিক নয়। এখন প্রশ্ন হলো; যদি কোনো ব্যক্তির উপর একের অধিক শপথের কাফফারা অপরিহার্য হয়, তবে কি একদিনেই একজন শরয়ী ফকিরকে প্রতিটি কাফফারার বদলে আলাদা আলাদা সদকায়ে ফিতর দেওয়া যাবে? অর্থাৎ একজন ফকিরকে প্রথম কাফফারার সদকায়ে ফিতর দেওয়ার পর ঐ দিনই দ্বিতীয় কাফফারার নিয়তে দ্বিতীয় সদকায়ে ফিতরও দেওয়া যাবে কি না?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জ্বি হ্যাঁ! যদি কোনো ব্যক্তির উপর একের অধিক শপথের কাফফারা অবাশ্যক হয়, তবে সে একজন শরয়ী ফকিরকে একই দিনে একটি কাফফারার নিয়তে সদকায়ে ফিতর আদায় করার পর ঐ একই ফকিরকে ঐ দিনই দ্বিতীয় কাফফারার সদকায়ে ফিতরও দিতে পারে; শর্ত হলো প্রতিটি কাফফারার সদকায়ে ফিতর আলাদা আলাদাভাবে দিতে হবে। যদি উভয় কাফফারার সদকায়ে ফিতর একসাথে আদায় করে, তবে শুধুমাত্র একটি কাফফারা আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। তবে যখন সে প্রতিটি কাফফারার সদকায়ে ফিতর আলাদা আলাদা দেবে, তখন প্রতিটি কাফফারা আদায় হওয়া শরীয়ত সম্মতভাবে সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য হবে।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে শেষ বৈঠকের (কাদায়ে আখিরা) পর ভুলে পঞ্চম রাকাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই বিষয়ে কী বলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে কাদায়ে আখিরা সম্পন্ন করার পর সালাম ফেরানোর পরিবর্তে ভুলে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং পঞ্চমের সিজদা করার পর তার মনে পড়ে, তবে তার জন্য হুকুম কী? সে কি সিজদায়ে সাহু করে সালাম ফেরাতে পারবে? নাকি পঞ্চম রাকাতের পর ষষ্ঠ রাকাত মিলানোও আবশ্যক? যদি আবশ্যক হয়, তবে ষষ্ঠ রাকাত না মিলানোর কারণে ঐ নামায কি পুনরায় পড়া জরুরী?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে কাদায়ে আখিরা সম্পন্ন করার পর যদি কেউ পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার জন্য হুকুম হলো; যদি সিজদা করার আগে মনে পড়ে যায়, তবে ফিরে এসে আত্তাহিয়্যাত পুনরাবৃত্তি করা ছাড়াই সিজদায়ে সাহু করে নামায সম্পন্ন করে নিবে। আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করার পর মনে পড়ে, তবে এমন ব্যক্তির উচিত আরও একটি রাকাত মিলিয়ে নিয়ে শেষে সিজদায়ে সাহু করে নামায সম্পন্ন করা; এভাবে প্রথম চার রাকাত ফরয এবং বাকি দুই রাকাত নফল হিসেবে গণ্য হবে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি ষষ্ঠ রাকাত না মিলায়, বরং পঞ্চম রাকাত সম্পন্ন করার পর সিজদায়ে সাহু করে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তবুও তার নামায সহীহ হয়ে যাবে; নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়। কারণ ষষ্ঠ রাকাত মিলানো ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব, আর মুস্তাহাব ত্যাগের কারণে নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক ও জরুরী নয়। তবে উত্তম হলো এমন নামায পুনরায় পড়ে নেওয়া, কিন্তু কেউ যদি না পড়ে তবে সে গুনাহগার হবে না।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ব্যবসার বিধান

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

দর্জি কাপড় খারাপ সেলাই করলে হুকুম কী?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, এক ব্যক্তি দর্জিকে সেলাইয়ের জন্য কাপড় দিয়েছে এবং যে মাপ দর্জিকে দেওয়া হয়েছিল, সে সেই মাপের চেয়ে ছোট সেলাই করে দিয়েছে। এখন সেই কাপড় ঐ ব্যক্তির গায়েও হচ্ছে না। তো আমাকে নির্দেশনা দিন যে, ঐ ব্যক্তির জন্য দর্জি থেকে নিজের কাপড়ের ক্ষতিপূরণ নেওয়া কি জায়িয? এছাড়া এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তির উপর দর্জিকে পারিশ্রমিক দেওয়া কি আবশ্যক হবে? যদি হয় তবে কতটুকু?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: এইভাবে কাপড় সেলাই করা যে, তা মাপের চেয়ে এত ছোট হয় যে, গায়েই লাগছে না; দর্জিদের নিকট এটি অনেক বড় পার্থক্য হিসেবে গণ্য হয়। এই অবস্থায় পবিত্র শরীয়তের হুকুম হলো, দর্জির নিকট থেকে নিজের সেই সেলাইবিহীন কাপড়ের ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে এবং এই অবস্থায় পারিশ্রমিক দেওয়া আবশ্যক হবে না। এটিও সুযোগ রয়েছে যে, কাপড় যেমন সেলাই হয়েছে তা নিয়ে নেবে এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিকের পরিবর্তে ঐ পারিশ্রমিক দেবে যা এমন কাপড় সেলাইয়ের জন্য দেওয়া হয়।

সদরুশ শরীয়া মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এর মূলনীতি হলো; যদি বেশি পার্থক্য হয় অর্থাৎ এই কাজের কারিগররা যদি বলে যে, এটি পার্থক্য, তবে সুযোগ রয়েছে যে, কাপড়ের দাম নেয়ার অথবা ঐ সেলাই করা কাপড়টিই নেবে এবং এই অবস্থায় সেলাইয়ের মজুরি তা-ই দেবে যা খারাপ সেলাইয়ের হওয়া উচিত, তা নয় যা আগে নির্ধারিত হয়েছিল। আর যদি সামান্য পার্থক্য হয় তবে ক্ষতিপূরণ নেওয়া জায়িয নয়।" (ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া, ৩/২৬৯)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'বাহারে শরীয়ত'-এ লিখেন: "দর্জিকে বলে দেওয়া হলো যে, এত লম্বা এবং এত চওড়া হবে এবং এতটুকু আস্তিন হবে কিন্তু সেলাই করে আনার পর যা বলা হয়েছে তার চেয়ে কম, যদি এক-আধ আঙ্গুল কম হয় তবে তা ক্ষমাযোগ্য এবং যদি বেশি কম হয় তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।" (বাহারে শরীয়ত, ৩/১৩৩)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পিকনিক থেকে বেঁচে যাওয়া টাকার হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি আমার বন্ধুদের থেকে সমান সমান টাকা জমা করেছি এবং নিজেও টাকা মিলিয়েছি এবং এই টাকা দিয়ে সবার জন্য ফার্মহাউজ বুক করেছি, যাতায়াত এবং খাওয়ার ইত্যাদির একই রকম ব্যবস্থা করেছি কিন্তু শেষে কিছু টাকা বেঁচে গেল। আমার প্রশ্ন হলো; এই বেঁচে যাওয়া টাকা কি আমি নিজে রাখতে পারি নাকি আমার বন্ধুদের ফেরত দিতে হবে?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় এই বেঁচে যাওয়া টাকার মধ্যে যা বাকি বন্ধুদের টাকা, তা আপনার জন্য নিজে রাখা জায়িয নয় বরং আপনার নিকট সেই টাকা আমানত। যেহেতু সমস্ত বন্ধুরা সমান সমান টাকা দিয়েছিল তাই আপনার উপর আবশ্যক যে, তাদের বেঁচে যাওয়া টাকা তাদের সমান সমান ফিরিয়ে দেবেন। কারণ আপনি আপনার বন্ধুদের পক্ষ থেকে ফার্মহাউজ বুক করার, খাওয়ার এবং যাতায়াত ইত্যাদির ব্যবস্থা করার উকিল ছিলেন। আর উকিল এসব জিনিসের জন্য যত টাকা পরিশোধ করবে ততটুকুই 'মুয়াক্কিল' হিসেবে কার্যকর হবে। আর উকিল যেহেতু আমানতদার হয়, তাই মুয়াক্কিলের দেওয়া টাকার মধ্যে যা বেঁচে যায় তাও উকিলের নিকট আমানত থাকে, যা সে নিজে রাখতে পারে না বরং মুয়াক্কিলকে ফেরত দেওয়া আবশ্যক হয়।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাসের ভাড়া দিতে ভুলে গেলে হুকুম কী?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি লোকাল বাসে এক স্থান থেকে অন্য স্থান পর্যন্ত সফর করেছি, সফরের সময় কন্ডাক্টর আমার নিকট ভাড়া চাইনি এবং আমিও তাকে ভাড়া দিতে ভুলে গিয়েছি, গন্তব্যে নামার পর মনে পড়ল। এখন এই বাসটি খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। এখন আমি ভাড়ার টাকার কী করব?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনার উপর আবশ্যক যে, ঐ বাসটি খুঁজে নিয়ে এই টাকা তাদের নিকট পৌঁছানো। বর্তমান সময়ে এই কাজ খুব বেশি মুশকিলও নয়। সাধারণত রুটের লোকাল বাসগুলো প্রতিদিন কাছাকাছি সময়ে নির্দিষ্ট স্থানগুলো দিয়ে অতিক্রম করে। অতএব প্রতিটি সম্ভবপর চেষ্টা করা, যেন ভাড়ার টাকা

আসল মালিকের নিকট পৌঁছে যায়। এরপর যদি কোনোভাবেই মালিকের পাওয়ার আশা বাকি না থাকে, তবে ভাড়ার টাকা আসল মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দিন। হ্যাঁ সদকা করার পর যদি কোনোভাবে ওই বাস পাওয়া যায় এবং বাসের আসল মালিক সদকা করাতে রাজি না হয় তবে এখন আপনাকে সেই টাকা তাকে পরিশোধ করতে হবে।

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, গাড়িতে সফর করেছে এবং কোনো কারণে ভাড়া দিতে পারেনি এখন তার কী করা উচিত? উত্তরে বলেন: "স্টেশনে যাওয়া গাড়িগুলো যদি কোনো প্রবল বাধা না থাকে তবে প্রতিটি গাড়িই যাতায়াতের সময় অবশ্যই আসে। যদি যায়েদ স্টেশনে খুঁজতো, পাওয়া সহজ ছিল; এখনো নিজে অথবা কোনো দ্বীনদার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে খুঁজবে, যদি পাওয়া যায় দিয়ে দিবে, নতুবা যখন নিরাশ হয়ে যাবে তখন তার পক্ষ থেকে সদকা করে দিবে। যদি পুনরায় কখনো তাকে পাওয়া যায় এবং এই সদকা করতে রাজি না হয়, তবে তাকে নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে দেবে।" (ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৫/৫৫)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জিনিসের হস্তগত হওয়ার আগে তা সদকা করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমার বন্ধুর শস্যের দোকান আছে। আমি তার থেকে দুই হাজার টাকার পণ্য কিনলাম, তবে সে আমার থেকে পণ্যের মূল্য নিল না এবং বলল যে, এই টাকা আমার অমুক বন্ধুকে নফল সদকা হিসেবে দিয়ে দিও। আমাকে নির্দেশনা প্রদান করুন যে, এই টাকা কি আমি আমার ঐ বন্ধুর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বন্ধুকে দিতে পারি? নাকি সদকা করার আগে এই টাকা দোকানদারের হস্তগত হওয়া জরুরী?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনি এই দুই হাজার টাকা দোকানদারের হাতে দেওয়া ছাড়াও দ্বিতীয় বন্ধুকে সদকা হিসেবে দিতে পারেন। কারণ শরয়ী মূলনীতির আলোকে বিক্রেতা যদি মূল্য (পণ্যের টাকা) হস্তগত করার আগে সেই টাকা সদকা করতে চায় তবে করতে পারে, এতে শরীয়তসম্মতভাবে কোনো সমস্যা নেই।

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "মূল্য (পণ্যের) হস্তগত করার আগে ব্যবহার জায়িয, তা বিক্রয়, দান, চুক্তি, সদকা এবং অসিয়ত সবকিছু করতে পারে।" (বাহারে শরীয়ত, ২/৭৪৯)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

(১) ঈদুল ফিতরের নাম 'মিষ্টি ঈদ' কেন?

প্রশ্ন: ঈদুল ফিতরকে মিষ্টি ঈদ কেন বলা হয়?

উত্তর: ঈদুল ফিতরকে মিষ্টি ঈদ সম্ভবত এই জন্য বলা হয় যে, এই ঈদে ঈদের নামাযের আগে বিজোড় সংখ্যায় (যেমন; এক, তিন, পাঁচ, সাত) খেজুর খাওয়া হয়, যা মুস্তাহাব। খেজুর না থাকলে বা খেতে না পারলে যেকোনো মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়ে নিন।

(মাদানী মুযাকারা, ১লা শাওয়ালুল মোকাররম ১৪৪১ হিঃ)

যাকাতের টাকা উপহার বা সালামি বলে দেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: যদি কোনো আত্মীয়কে যাকাতের টাকা দিই তবে কি তাদের জানানো জরুরী যে, এই টাকা যাকাতের?

উত্তর: যদি যাকাতের হকদারকে উপহার বা সালামি বলে যাকাত দেওয়া হয়, তবে তা আদায় হয়ে যাবে, যাকাত বলা জরুরী নয়; কারণ অনেক সময় সম্মুখস্ত ব্যক্তি আত্মমর্যাদাশীল মধ্যবিত্ত হয়ে থাকে এবং যাকাত নামে নেওয়া তার নিকট কষ্টদায়ক মনে হয়।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ই মুহাররামুল হারাম শরীফ ১৪৪১ হিঃ)

একটি পংক্তির ব্যাখ্যা

প্রশ্ন: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই পংক্তির ব্যাখ্যা করে দিন:

اہلِ عمل کو اُن کے عمل کام آئیں گے
میرا ہے کون تیرے سوا آہ! لے خبر

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ৬৮)

উত্তর: এই পংক্তিতে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলছেন যে, কিয়ামতের দিন নেক বান্দাদের তো তাদের নেক আমল কাজে আসবে; ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কিয়ামতে আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই। অনুরূপভাবে অন্য কারো পংক্তি হলো:

مِرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رَحمتِ عالَم
میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے

(মাদানী মুযাকারা, ১লা শাওয়ালুল মোকাররম ১৪৪১ হিঃ)

মহিলার নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা কেমন?

প্রশ্ন: ঘরে মহিলা একা থাকলে কি সে নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করতে পারে?

উত্তর: মহিলার জন্য নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করার অনুমতি নেই; সে শুধু এতটুকু আওয়াজে কিরাত পাঠ করবে, যেন তার নিজের কান পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছায়।

(মাদানী মুযাকারা, ৫ই রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিঃ)

মহিলার নাক না ফোঁড়ানো কেমন?

প্রশ্ন: যদি মহিলা নাক না ফোঁড়ায় তবে কি সে গুনাহগার হবে?

উত্তর: গুনাহ হবে না। এখন তো সম্ভবত মহিলাদের নাক ফোঁড়ানোর রেওয়াজ কমে গেছে, এর পরিবর্তে স্টিকার লাগায়। অবশ্য কান ফোঁড়ানোর রেওয়াজ অবশিষ্ট আছে, এটিও কখন শেষ হয়ে যায় তার ঠিক নেই; হতে পারে কানেরও এমন কোনো স্টিকার চলে আসবে যা শক্তভাবে লেগে যাবে, তখন হয়তো কান ফোঁড়ানোর রেওয়াজও শেষ হয়ে যাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ১০ই রমযানুল মোবারক ১৪৪১ হিঃ)

শিশুদের মাঝে পড়াশোনার আগ্রহ সৃষ্টি করার পদ্ধতি

প্রশ্ন: শিশুদের পড়াশোনায় মন বসে না, তাদের মন পড়াশোনায় কীভাবে লাগাব?

উত্তর: যদি শিশু কুরআনে করীম পড়ায় মন না লাগায় তবে তার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য মাঝেমধ্যে কোনো না কোনো জিনিস দেওয়া যে, বাবা! সবক পড়ো, তোমাকে এই জিনিস দেওয়া হবে। যেমন; খাওয়ার কোনো জিনিস দিয়ে দিলেন যা তার পছন্দ এবং স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর নয়। একইভাবে নোট বা মুদ্রা দেখিয়ে দিলেন যে, সবক পড়লে এটি পাওয়া যাবে; আর যদি সে পড়ে নেয় তবে নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন। শিশুর পছন্দের জিনিস দিলে সে প্রেরণা পাবে এবং প্রবল আগ্রহে পড়বে; কিন্তু সবসময় এমনটি করলে শিশুর অভ্যাস নষ্ট হতে পারে যে, জিনিস পেলে পড়বে নতুবা পড়বে না। যাই হোক, শিশুর মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য কোনো জিনিস দিয়ে অথবা কোনো জিনিস না দিয়েই কৌশলে এবং আদর করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পড়ার অভ্যাস করান; যখন অভ্যাস হয়ে যাবে তখন اِنْ شَآءَ الله পড়তে থাকবে। (মাদানী মুযাকারা, ২৯শে রমযানুল মোবারক ১৪৪১ হিঃ)

সবার আগে পঙ্গপাল ধ্বংস হবে এরপর অন্যান্য সৃষ্টি

প্রশ্ন: দুনিয়ায় কি সবার আগে পঙ্গপাল শেষ হবে?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতের যুগে পুরো এক বছর পর্যন্ত পঙ্গপাল দেখা না গেলে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইয়েমেন, ইরাক এবং সিরিয়ার দিকে একজন করে আরোহী পাঠালেন যাতে তারা পঙ্গপাল সম্পর্কে তথ্য নেয় যে, হয়তো কেউ কোনো পঙ্গপাল দেখেছে। যখন

ইয়েমেনের দিকে প্রেরিত আরোহী ফিরে এল তখন তার হাতে কিছু পঙ্গপাল ছিল যা তাঁর সামনে রাখা হলো; সেগুলো দেখে তাঁর মুখমন্ডলে মুচকি হাসি ফুটে এল এবং উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন এবং বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ পাক ১০০০ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে ৬০০ পানিতে এবং ৪০০ স্থলে। সবার আগে পঙ্গপাল ধ্বংস হবে, এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য সৃষ্টিও ধ্বংস হতে থাকবে। (দেখুন: শুয়াবুল ঈমান, ৭/২৩৪, হাদীস: ১০১৩২) হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর খোদাভীতির অবস্থা এমন ছিল যে, আশেপাশে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিদ্যমান এবং দাজ্জালেরও প্রকাশ ঘটেনি কিন্তু পঙ্গপাল দেখা না যাওয়ায় ঘাবড়ে গেলেন। (দেখুন: মিরআতুল মানাজিহ, ৭/২৭৪। মাদানী মুযাকারা, ১৫ই শাওয়ালুল মোকাররম ১৪৪১ হিঃ)

পাতিলে খাবার আহারকারীর বিয়েতে কি বৃষ্টি হয়?

প্রশ্ন: মানুষের মাঝে এই কথাটি প্রসিদ্ধ যে, "পাতিলে খাবার আহারকারীর বিয়েতে বৃষ্টি হয়ে যায়!" এই কথাটি কি সঠিক?

উত্তর: সাধারণ মানুষের এই ধারণা ভুল। এমনিতে পাতিলে খাওয়ার প্রথা নেই, প্লেট ইত্যাদিতে খাওয়া হয়। হ্যাঁ! যদি কারো খুব ক্ষুধা লাগে এবং প্লেট না থাকে অথবা এমনিতেই পাতিল থেকে খেয়ে নেয় তবুও কোনো অসুবিধা নেই। (মাদানী মুযাকারা, ২রা যিলহজ্জুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর ইমামতি করা কেমন?

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারী ব্যক্তি কি জানাযার নামায পড়াতে পারে অথবা ইমামতি করাতে পারে?

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ। যদি কোনো ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয় তবে সে আযানও দিতে পারে, ইমামতির যোগ্য হলে নামাযও পড়াতে পারে, জুমা পড়ানোর যোগ্য হলে জুমাও পড়াতে পারে এবং বিবাহও পড়াতে পারে। মৃতকে গোসল দেওয়ায় কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হয় না এবং মৃতকে গোসল দানকারীর উপর গোসল ফরযও হয় না। অবশ্য মৃতকে গোসল দেওয়ার পর নিজে গোসল করে নেওয়া মুস্তাহাব। যদি কেউ মৃতকে গোসল দেওয়ার পর গোসল না করে তবে সে গুনাহগার হবে না। (মাদানী মুযাকারা, ২৫শে যিলহজ্জুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

হযরত উমায়ের বিন ওয়াহাব জুমাহী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

মাওলানা আদনান আহমেদ আত্তারী মাদানী

মহান সাহাবী হযরত উমায়ের বিন ওয়াহাব জুমাহী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম গ্রহণের আগে ইসলাম এবং মুসলমানদের কট্টর বিরোধী ছিলেন। তিনি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দের তীব্র কষ্ট দিতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি নবুয়তের মুজিযার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

(সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ২৭৪)

গযওয়ায়ে বদরের আগে:

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গযওয়ায়ে বদরে মুশরিকদের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু তিনি অনেক সাহসী ছিলেন এবং কুরাইশদের মাঝে খুবই সম্মানের মর্যাদা রাখতেন। (আল ইস্তিআব, ৩/২৯৪) তাই কুরাইশরা তাঁকে মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তির অনুমান করার জন্য পাঠিয়েছিল। তিনি তাঁর ঘোড়ায় চড়ে ইসলামী বাহিনীর চারপাশ প্রদক্ষিণ করলেন এবং বললেন: মুসলমানরা ৩০০ এর কাছাকাছি। এরপর উপত্যকা প্রদক্ষিণ করে এসে খবর দিলেন: তাদের পেছনে কোনো সাহায্য নেই। এরপর বললেন: হে কুরাইশ দল! আমি এমন বিপদ দেখেছি যা মৃত্যুকে বহন করে আনছে। এই লোকদের কাছে তাদের তলোয়ার ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। এখন তোমরা তোমাদের মতামতে চিন্তা করে নাও (যে, যুদ্ধ করতে হবে কিনা)। বদর যুদ্ধে কুরাইশ কাফেরদের চরম পরাজয় হলো এবং তাঁর ছেলে "ওয়াহাব" মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো।

(সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ২৭৪) তিনি নিজে এক আনসারী সাহাবীর হাতে প্রবল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে রইলেন কিন্তু রাতের ঠান্ডায় কিছুটা সুস্থ হলে লুকিয়ে লুকিয়ে মক্কায় পৌঁছে গেলেন এবং আরোগ্য লাভ করলেন।

(তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৪/১৫১)

হত্যার পরিকল্পনা:

কিছু দিন পর তিনি এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া হাতীমে কাবায় বসে বদরের নিহতদের স্মরণ করছিলেন। (সাফওয়ানের বাবা উমাইয়া বিন খালাফও বদরের ময়দানে মারা গিয়েছিল)। সাফওয়ান বলল: আল্লাহ পাকের শপথ! তাদের পর জিন্দেগীতে কোনো স্বাদ নেই। তিনি বললেন: তুমি সত্য বলেছ। আল্লাহ পাকের শপথ! যদি আমার উপর ভারী ঋণ না থাকত এবং আমার পর আমার সন্তানদের অভাবের চিন্তা না থাকত, তবে আমি মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কাছে গিয়ে তাঁকে হত্যা করে আসতাম। আমার কাছে সেখানে যাওয়ার একটি বাহানাও আছে যে, আমার ছেলে তাঁদের বন্দীশালায় রয়েছে। সাফওয়ান তৎক্ষণাৎ বলল: তোমার ঋণের যিম্মাদারী আমার উপর, আমি তা পরিশোধ করব এবং আমি তোমার সন্তানদের লালন-পালনের যিম্মাদারী নেব। তিনি বললেন: তবে তুমি এই বিষয়টি গোপন রেখো। সাফওয়ান গোপনীয়তার ওয়াদা করল।

(সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ২৭৪)

মদীনার সফর:

তিনি তলোয়ার ধার করালেন এরপর তাতে বিষ মাখালেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। মসজিদে নববীর কাছাকাছি পৌঁছালে ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ চিনে ফেললেন এবং বললেন: এ আল্লাহর দুশমন উমায়ের বিন ওয়াহাব! আল্লাহ পাকের শপথ! সে কোনো মন্দ উদ্দেশ্য এসেছে। তৎক্ষণাৎ বারগাহে রিসালাতে উপস্থিত হয়ে খবর দিলেন। রহমতে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার কাছে নিয়ে এসো। ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে কঠোরভাবে টেনে ধরে বারগাহে রিসালাতে নিয়ে এলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ২৭৪)

গায়বি খবরের প্রকাশ:

রাসূলে মুকাররম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে উমায়ের! তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছ? আরয করল: আমার বন্দী ছেলের জন্য এসেছি, আপনি তার প্রতি দয়া করুন। ইরশাদ হলো: তবে ঘাড়ে এই তলোয়ার কেন ঝুলে আছে? আরয করল:

আল্লাহ পাক এই তলোয়ারগুলোর কল্যাণ না করুক, এগুলো কি আমাদের কোনো কাজে এসেছে? রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সত্য বলো! কেন এসেছ? তিনি সেই একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এবং সাফওয়ান হাতীমে বসেছিলে, তোমরা কুরাইশদের নিহতদের কথা স্মরণ করেছিলে এবং বলেছিলে: যদি আমার উপর ঋণ এবং সন্তানদের বোঝা না থাকত তবে আমি মুহাম্মদকে হত্যা করতাম। এতে সাফওয়ান তোমার ঋণের এবং সন্তানদের যিম্মাদারী এই শর্তে নিয়ে নিয়েছে যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে, কিন্তু আল্লাহ পাক আমার এবং তোমার উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তরায় হয়েছেন। এটি শুনে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অবাক হয়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বলে উঠলেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসূল। আমরা আপনাকে আসমানি খবর এবং ওহীর বিষয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম, কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় ছিল, যা আমি এবং সাফওয়ান ছাড়া আর কেউ জানত না। খোদার কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই খবর আপনাকে আল্লাহ পাকই দিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করলেন: তোমাদের ভাইকে দ্বীন বুঝিয়ে দাও, তাকে কুরআন পড়াও এবং তাঁর বন্দিকে মুক্ত করে দাও। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁকে কুরআন শেখালেন এবং তাঁর বন্দি ছেলে "ওয়াহাব"কে মুক্ত করে দিলেন, তিনিও ইসলাম কবুল করে নিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ২৭৪)

মক্কায় প্রত্যাবর্তন:

যখন হযরত উমায়ের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মক্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ পাকের নূর নেভাতে এবং মুসলমানদের কষ্ট দিতে অগ্রগণ্য ছিলাম, এখন আপনার কাছে অনুমতি চাই যাতে মক্কাবাসীদের আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকি এবং ইসলামের দাওয়াত দিই; নতুবা যেভাবে আমি মুসলমানদের দ্বীনে হক কবুল করার কারণে কষ্ট দিতাম, ঠিক তেমনি এই কাফেরদের কুফর ও শিরিক না ছাড়ার কারণে কষ্ট দেব। রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। অন্যদিকে মক্কায় সাফওয়ান লোকদের সুসংবাদ দিত যে, কিছু দিনের মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটবে, যা তোমাদের বদরের দুঃখ ভুলিয়ে

দেবে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ২৭৪) হযরত উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মক্কায় ফিরে এসে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করলেন, এরপর পরিবারের লোকদেরও ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন। সাফওয়ান জানতে পেরে বলতে লাগল: আমি কখনো উমায়েরের সাথে কথা বলব না। একবার সাফওয়ান নিজের ঘরে ছিল, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার কাছে গেলেন এবং তাকে ডাকলেন কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। তিনি বললেন: হে সাফওয়ান! তুমি আমাদের গোত্রের সরদার, আমরা পাথরের ইবাদত করতাম এবং তাদের জন্য জবাই করতাম; তুমি কী মনে করো যে, এটিই কি দ্বীনে হক? কিন্তু সাফওয়ান কোনো উত্তর দিল না। (আল ইস্তিআব, ৩/২৯৫)। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মক্কাবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম বিরোধীদের কষ্ট দিতে লাগলেন। তাঁর চেষ্টায় অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ২৭৫) এরপর তিনি মদীনার দিকে হিজরত করলেন। (আল আলামু লিজ যুরকালী, ৫/৯০)

সাফওয়ান নিরাপত্তা পেল:

মক্কা বিজয়ের সময় সাফওয়ান জেদ্দার দিকে পালিয়ে গেল যাতে সমুদ্রপথে ইয়েমেনে চলে যায়। হযরত উমায়ের বারগাহে রিসালাতে আরয করলেন: আমার গোত্রের সরদার সাফওয়ান পালিয়ে গেছে, আপনি তাকে নিরাপত্তা দান করুন। ইরশাদ হলো: সে নিরাপত্তায় রয়েছে এবং চিহ্ন হিসেবে নিজের ঐ পাগড়ি মুবারক দান করলেন, যা পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পাগড়ি মুবারক নিয়ে সাফওয়ানের কাছে পৌঁছালেন এবং তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাফওয়ানকে নিরাপত্তা দান করে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য চার মাসের সময় দিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম কবুল করে নিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭৫)

গযওয়া ও ওফাত:

হযরত উমায়ের বিন ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গযওয়ায়ে উহুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। (আল আলামু লিয যুরকালী, ৫/৯০) তিনি মিশর বিজয়ের প্রাণ উৎসর্গকারীদের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (আল ইস্তিআব, ৩/২৯৫) ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফতের যুগে ২২ হিজরীর পর তাঁর ওফাত হয়। (আল আলামু লিয যুরকালী, ৫/৯০। আনসাবুল আশরাফ লিল বালাযুরী, ১০/২৫৩) একটি উক্তি অনুযায়ী তিনি হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফতের শুরুর দিকে ওফাত লাভ করেন। (আল ইস্তিআব, ৩/২৯৫)

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়েল

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

(১) مَاشَآءَاللّٰه এর অক্ষরগুলোকে অযু ছাড়া স্পর্শ করা কেমন?

ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমাদের এখানে মহিলারা হিজাবের মধ্যে একটি পট্টি ব্যবহার করেন, যার উপর কুরআনী বাক্য "مَاشَآءَاللّٰه" লেখা থাকে। একইভাবে পুরুষদের জন্যও পট্টি আসে, যা বাহুতে বাঁধা হয়, এর উপরও "مَاشَآءَاللّٰه" লেখা থাকে। প্রশ্ন হলো; এমন কাপড় বা পট্টি কি অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে কিনা?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

বর্ণিত অবস্থায় এমন পট্টি যার উপর "مَاشَآءَاللّٰه" বাক্য লেখা আছে, তা অযু ছাড়া স্পর্শ করতে পারবে। শরয়ী এতে গুনাহ নেই। কারণ সাধারণত এই ধরণের জিনিসগুলোতে এই বাক্যগুলো কুরআনী আয়াতের তিলাওয়াত হিসেবে নয়, বরং বরকত অর্জন করার জন্য অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে; যেমন কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য লেখা হয়। এই কারণে এমন বাক্যগুলো যা এই উদ্দেশ্যগুলোর জন্য লেখার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোকে অযু বিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা গুনাহ নয়। হ্যাঁ! অযু ও পবিত্রতার অবস্থায় স্পর্শ করা উত্তম। তবে এটি মনে রাখবেন যে, এগুলো পরিহিত অবস্থায় শৌচাগারে যাওয়া নিষেধ।

ফিকহি বিচারে এর দৃষ্টান্ত হলো "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ"। যা আমাদের এখানে কিতাব বা লেখনী ইত্যাদির শুরুতে লেখা হয় এবং এতে সাধারণত কুরআনী আয়াতের তিলাওয়াত উদ্দেশ্য থাকে না, বরং আল্লাহ পাকের পবিত্র নামসমূহ দ্বারা বরকত নেওয়া উদ্দেশ্য থাকে। একইভাবে কালেমায়ে ইস্তিরজা "اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ" যে, এটিকে নিছক দুঃখ প্রকাশের জন্য অথবা শোকের সংবাদের উত্তরে অথবা বিপদের সময় এই বাক্যটি বলা হাদীসে পাকে বর্ণিত ফযীলত পাওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা ও বলা হয়। এই উভয় বাক্য দোয়া, প্রশংসা ও বরকত ইত্যাদির নিয়তে লেখা ও বলার মধ্যে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলন রয়েছে যে; প্রতিটি সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি কোনো বিশেষ মুহূর্তে এই বাক্যগুলোকে দোয়া ও প্রশংসা হিসেবে অথবা তাবাররুক হিসেবে লেখেন ও বলেন। আর লেখা ও বলার সময় কুরআনের তিলাওয়াতের দিকে মনোযোগই থাকে না। একইভাবে "مَاشَآءَاللّٰه" বাক্যটিও

বরকত অর্জন অথবা কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য লেখা হয়। এই কারণে এই বাক্যটি অযু ছাড়া লেখা এবং স্পর্শ করা জায়িয।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) কিয়াম, রুকু ও সেজদায় অক্ষম ব্যক্তির জন্য শরয়ী হুকুম

ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই বিষয়ে কী বলেন যে, একজন মহিলার ইস্তিহাযার রোগ রয়েছে। তাঁর দাঁড়িয়ে নামায পড়লে এবং রুকু ও সিজদায় ঝুঁকে পড়ার কারণে রক্ত আসে, অথচ বসে ইশারায় নামায পড়ার ক্ষেত্রে রক্ত আসে না। তবে এই অবস্থায় এই মহিলার জন্য শরয়ী হুকুম কী?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় এই মহিলার উপর আবশ্যক যে, বসে ইশারায় নামায পড়বে। কারণ প্রতিটি সেই পদ্ধতি যার দ্বারা শরয়ী মাযুরের অক্ষমতা দূর হয়ে যায় অথবা তাতে হ্রাস ঘটে, তা অবলম্বন করা মাযুরের জন্য ওয়াজিব। আর এমনটি করার মাধ্যমে শরয়ী মাযুরের হুকুমও শেষ হয়ে যাবে, যতক্ষণ অক্ষমতা শেষ হওয়ার অন্যান্য শর্তও পাওয়া যায়।

মাসআলাটির বিশ্লেষণ এরূপ যে, শরয়ী অনুমতি ছাড়া নামাযে কিয়াম এবং রুকু ও সিজদা করাও জরুরী। তবে অযু ছাড়া নামায পড়ার তুলনায় কিয়াম এবং রুকু ও সিজদা ত্যাগ করা কিছুটা হালকা হুকুম রাখে। কারণ পবিত্র শরীয়তে ইচ্ছাধীন অবস্থায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিয়াম এবং সিজদা ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছে; যেমন; নফল নামায আদায়কারীকে বসে অথবা শহরের বাইরে বাহনের উপর ইশারায় নফল নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে। অথচ ইচ্ছাধীন অবস্থায় অযু ছাড়া নামায পড়ার কোনো অবস্থাতেই অনুমতি নেই। আর শরয়ী মূলনীতি হলো; যখন কোনো ব্যক্তি দুটি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন সে তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজ বা নিম্নতরটি অবলম্বন করে। অতএব উল্লিখিত মহিলাও পবিত্রতা ও অযু বজায় রাখার জন্য বসে ইশারার সাথে নামায পড়বে।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইতিকাফের রুহানিয়তে বাধা এবং এর সমাধান

মাওলানা আবুল নূর রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে ইতিকাফের সুন্নাতে মুবারাকাকে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য বিশেষ উপহার বানিয়েছেন। এগুলো সেই বরকতময় দিন, যখন বান্দা দুনিয়ার সব ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের প্রতিপালকের ঘরে অবস্থান করে, তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে রাত কাটায় এবং নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে নতুন মানুষ হয়ে বের হয়। ইতিকাফ কেবল মসজিদে বসে থাকার নাম নয় বরং এটি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের একটি ব্যবহারিক ধাপ, এটি নফসের সংশোধনের মাধ্যম এবং এটি আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করার সুবর্ণ সুযোগ।

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি বছর ইতিকাফ করেছেন এবং এর ফযিলত ও মহত্ত্ব স্পষ্ট করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইতিকাফকে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, সারা বছর এর অপেক্ষা করতেন। এগুলো সেই বরকতময় দিন যাতে শবে কদর অন্বেষণ করা হয়, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

ইতিকাফের উদ্দেশ্য

(১) ইতিকাফের একটি উদ্দেশ্য হলো; বান্দা তার প্রকৃত স্রষ্টার সাথে তার ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক পুনরায় শক্ত করে। সারা বছর আমরা দুনিয়া অর্জনে এতটাই ব্যস্ত থাকি যে, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যাই। নামাযও আদায় করি তো মন অন্য কোথাও পড়ে থাকে। কুরআন পাকের তিলাওয়াতও করি তো কেবল জিহ্বা নড়ে, মন তাতে খুব কমই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(২) ইতিকাফে যখন বান্দা দশ দিনের জন্য দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সে তার প্রতিপালককে ডাকার সুযোগ পায়। তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করার সুযোগ পায়। কুরআন পাক তিলাওয়াত করার সময় এর অর্থের প্রতি চিন্তা করার সময় পায়। যিকিরে লিপ্ত হয়ে অন্তর পবিত্রতা পায়।

(৩) ইতিকাফ নফসের প্রশিক্ষণের সুবর্ণ সুযোগ। যখন মানুষ দশ দিনের জন্য দুনিয়াবি আরাম-আয়েশ থেকে দূরে সরে যায়, আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে মসজিদের মেঝেতে ঘুমাতে শুরু করে, সাধারণ খাবারে সন্তুষ্ট থাকে তখন তার

নফস প্রশিক্ষণ পায়। নফস বুঝতে পারে যে, আসল জীবন তো আখিরাতের জীবন এবং এই দুনিয়া তো কয়েক দিনের।

(৪) ইতিকাফে বান্দা তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শিখে। অনর্থক কথা বলা থেকে বাঁচতে শিখে। গীবত, চোগলখুরি, মিথ্যা এবং জিহ্বার অন্যান্য গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার অভ্যাস করে। চোখকে না-মুহরিম থেকে বাঁচানোর অভ্যাস গড়ে ওঠে। এই দশ দিন নফসের এমন প্রশিক্ষণ হয় যে, যদি সঠিকভাবে কাটানো যায় তবে মানুষ নতুন মানুষ হয়ে বের হয়।

(৫) রমযানুল মোবারক গুনাহ ক্ষমার মাসও এবং ইতিকাফ এই ক্ষমা পাওয়ার বিশেষ মাধ্যম। যখন বান্দা মসজিদে বসে নিজের গুনাহের হিসাব নেয়, নিজের ভুলগুলো মনে করে এবং খাঁটি অন্তরে তাওবা করে তখন আল্লাহ পাক তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন।

(৬) ইতিকাফে মানুষ এই সুযোগ পায় যে, সে তার জীবনের পর্যালোচনা করে। দেখে যে কোন কোন গুনাহে লিপ্ত ছিল। কোন লোকের অধিকার ক্ষুন্ন করেছে। কাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং আগামী জীবন কীভাবে আরও ভালো করা যায়। এই নির্জনতা ও একাকীত্ব মানুষকে নিজের সংশোধনের সুযোগ প্রদান করে।

(৭) ইতিকাফের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য শবে কদর অন্বেষণ করা। এটি সেই রাত, যার ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, এই রাতকে রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে অন্বেষণ করো।

(বুখারী, ১/৬৬১, হাদীস: ২০১৮)

দুঃখজনক বাস্তবতা: উদ্দেশ্য অর্জন কেন হয় না?

আফসোস যে, বর্তমানে অনেক লোক ইতিকাফ তো করে কিন্তু ইতিকাফের আসল উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। দশ দিন মসজিদে কাটিয়ে দেয় কিন্তু অন্তরে কোনো পরিবর্তন আসে না। জীবনে কোনো সংশোধন হয় না। ইতিকাফের আগে যেমন ছিল ইতিকাফের পরেও তেমনই থাকে। এর কারণ কী? আসুন বিস্তারিত পর্যালোচনা করি:

মোবাইল ফোনের যথেচ্ছ ব্যবহার:

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় বিপদ মোবাইল ফোনের অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক ব্যবহার। এটি এমন এক জিনিস যা মানুষকে আল্লাহ পাক থেকে দূরে করে দিয়েছে। ইতিকাফেও অনেক লোক তাদের মোবাইল সাথে রাখে এবং মাঝে মাঝে তা ব্যবহার করতে থাকে। কেউ কিছুক্ষণ পর পর হোয়াটসঅ্যাপ চেক করছে। কেউ ফেসবুক স্ক্রল করছে। কেউ ইউটিউবে ভিডিও দেখছে। মোবাইল ফোনের কারণে ইতিকাফের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যে সময় কুরআন পাকের তিলাওয়াতে কাটানো উচিত তা মোবাইলে অনর্থক কথা বলে কেটে যায়। যে সময় যিকিরে কাটানো উচিত, তা সোশ্যাল মিডিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়।

বন্ধুদের সাথে আড্ডা ও অনর্থক কথা:

ইতিকাফে অনেক লোক সাক্ষাতের জন্য আসা তাদের বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে গ্রুপ বানিয়ে বসে এবং তারপর সারা সময় অনর্থক

কথায় কেটে যায়। সারা দুনিয়ার কথা, রাজনীতির কথা, ব্যবসার কথা, ক্রিকেটের কথা। যেন কোনো পার্টিতে বসে আছে। এই সাক্ষাৎগুলো ইতিকাফকারীর মূল্যবান সময় নষ্ট করে এবং তার মনোযোগ ইবাদত থেকে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা ভুলে যায় যে, ইতিকাফে প্রতিটি কথার হিসাব হবে। মসজিদে দুনিয়ার কথা বলা গুনাহ। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; যে মসজিদে দুনিয়ার কথা বলে, আল্লাহ পাক তার ৪০ বছরের আমল নষ্ট করে দেন। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ১৬/৩১১)

খাবারের চিন্তা ও পরিকল্পনা:

কিছু লোকের পুরো মনোযোগ খাবারের প্রতি থাকে। সাহরীতে কী খাওয়া হবে, ইফতারে কী খাওয়া হবে। বন্ধুরা বাইরে থেকে কাবাব সমুচা নিয়ে আসলে তো খাবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেন ইতিকাফে আসার উদ্দেশ্যই হলো খাওয়া-দাওয়া। ইতিকাফে তো খাবারের দিকে কম মনোযোগ দেওয়া উচিত। যা কিছু পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। নফসকে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত যে, দুনিয়ার স্বাদের প্রয়োজন নেই।

পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও দাবি:

কিছু লোক ইতিকাফে তো বসে থাকে কিন্তু পরিবারের সাথে সবসময় অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগে থাকে। দিনে কয়েকবার ফোন করে। ঘরের ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে থাকে। পরিবারের সদস্যদের কাজ বলতে থাকে। কেউ কেউ তো পরিবারের কাছে দাবিও করতে থাকে। এই জিনিস নিয়ে এসো, ওই জিনিস নিয়ে এসো। অমুক খাবার পাঠিয়ে দাও, অমুক কাপড় পাঠিয়ে দাও। ইতিকাফে বসে আছে কিন্তু মন পুরোপুরি ঘরে লেগে আছে। ইতিকাফের উদ্দেশ্যই হলো দুনিয়াবি বিষয় থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং কেবল আল্লাহ পাকের প্রতিই মনোযোগী হওয়া। কিন্তু যখন পরিবারের সাথে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগে থাকবে তখন এই উদ্দেশ্য কীভাবে অর্জিত হবে?

ঘুম ও অলসতার প্রভাব:

কিছু লোক ইতিকাফে সারা দিনই ঘুমাতে থাকে। রাতে তাহাজ্জুদের সময়ও ওঠে না। নামাযের পর সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ে। যেন ইতিকাফ তাদের জন্য আরাম ও ঘুমের সুযোগ হয়ে গেছে। এটি ইতিকাফের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইতিকাফে তো রাতে বেশি ইবাদত করা উচিত এবং দিনেও ইবাদত, যিকির, তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকা উচিত। প্রয়োজন অনুযায়ী ঘুমানো যেতে পারে কিন্তু বেশির ভাগ সময় ইবাদতে কাটানো উচিত।

ইতিকাফের রুহানি উপকারিতা কীভাবে অর্জন করবেন?

এখন প্রশ্ন হলো এই বাধাগুলো কীভাবে দূর করবেন এবং ইতিকাফের প্রকৃত উপকারিতা কীভাবে অর্জন করবেন? আসুন কিছু ব্যবহারিক পরামর্শ দেখি:

ইতিকাফে প্রবেশের সময় এই অঙ্গীকার করে নিন যে, দশ দিন মোবাইল ব্যবহার করবেন না। যদি কোনো অত্যন্ত জরুরি কথার জন্য পরিবারের সাথে যোগাযোগ জরুরি হয় তবে করে নিন কিন্তু কেবল প্রয়োজনের সীমা পর্যন্তই করুন।

ইতিকাফে বন্ধুদের গ্রুপ থেকে আলাদা থাকুন। অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকুন। যখনই কথা বলতে হয় তখন প্রয়োজনের কথা বলুন এবং তাও নিম্ন স্বরে।

ইতিকাফের আগে একটি লক্ষ্য ঠিক করে নিন যে, দশ দিনে কী করতে হবে। কতবার কুরআন খতম করতে হবে? কোন কোন দোয়া মুখস্থ করতে হবে? কোন কিতাব পড়তে হবে? কত নফল পড়তে হবে?

এই লক্ষ্য লিখে নিন এবং প্রতিদিন এর উপর আমল করুন। রাতে ঘুমানোর আগে দেখুন যে, আজকের পরিকল্পনা কতটা পূর্ণ হলো। কাল কী করতে হবে। এভাবে সময়ের সঠিক ব্যবহার হবে এবং বরকত নসিব হবে।

দাওয়াতে ইসলামীর ইতিকাফে যেই মাদানী মুযাকারা, দরস বা বয়ান হয় তাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন। বরং প্রথম সারিতে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। নোট তৈরি করুন। যেই বিষয়গুলো বুঝবেন না পরে জিজ্ঞাসা করে নিন।

ইতিকাফের বরকত রাতের ইবাদতেও রয়েছে। বিশেষ করে তাহাজ্জুদের নামাযের খুব বেশি আয়োজন করুন। প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের জন্য অবশ্যই উঠুন। কুরআন পাক তিলাওয়াত করুন, দোয়া চান।

শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে তো সারা রাত জেগে থাকুন। এই ভেবে ইবাদত করুন যে, হয়তো এটিই শবে কদর। যদি সত্যিই শবে কদর পেয়ে যান তবে সারা জীবনের জন্য সফল হয়ে যাবে।

ইতিকাফে এটাও ভাবুন যে, ইতিকাফের পরের জীবন কীভাবে কাটাবেন। নিজের চরিত্র কীভাবে ভালো করবেন। এই সব লিখে নিন এবং অঙ্গীকার করুন যে, ইতিকাফের পর এর উপর আমল করবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইতিকাফ কেবল মসজিদে বসে থাকার নাম নয় বরং এটি রুহানি প্রশিক্ষণের একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক ব্যবস্থা এবং দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে আয়োজিত সম্মিলিত ইতিকাফে এই ব্যাপক প্রশিক্ষণের সুন্দর আয়োজন করা হয়। এই বরকতময় ইতিকাফে নিয়মিত সময়সূচি অনুযায়ী তাহাজ্জুদের জন্য জাগানোর আয়োজন থাকে, নামাযে সুন্নাত ও নফলের নিয়মিত মানসিকতা দেওয়া হয়, কুরআন পাক তিলাওয়াতের শিক্ষা দেওয়া হয়, নামায, পবিত্রতা, রোযা এবং অন্যান্য জরুরি শরয়ী মাসায়িলের শিক্ষা প্রদান করা হয়, চারিত্রিক এবং অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী দিকের উপর বয়ান এবং মাদানী হালকা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশেষ করে প্রতিদিন আসরের পর এবং তারাবীর পর শায়খে তরীকত আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা হয়, যাতে বিভিন্ন দ্বীনি প্রশ্নের তৃপ্তিদায়ক উত্তর পাওয়া যায়। তাই আপনিও দাওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণ করুন এবং নিজের দ্বীনি ও রুহানি জীবন সাজানোর এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ইতিকাফের সঠিক অর্থের সৌভাগ্য নসিব করুন এবং আমাদের এর সমস্ত উপকারিতা ও বরকত দিয়ে ধন্য করুক। اٰمِين

নিজের বুযুর্গদের স্মরণ করুন

মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

রমযানুল মোবারক ইসলামী বছরের নবম মাস। এই মাসে যেসব সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে এজাম এবং ওলামায়ে ইসলামের ওফাত বা ওরস হয়, তাদের মধ্যে ১১৮ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" রমযানুল মোবারক ১৪৩৮ হিজরি থেকে ১৪৪৬ হিজরি সংখ্যায় করা হয়েছে আরও ১২ জনের পরিচিতি নিচে তুলে ধরা হলো:

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان:

(১) হযরত আউফ, হযরত মুআব্বিয এবং হযরত মুয়ায বিন হারিস খাযরাজী আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ, তিনজন ভাই বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁদের মায়ের সূত্রে তাঁরা "ইবনে আফরা" নামে পরিচিত ছিলেন। ১৭ই রমযানুল মোবারক ২য় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধে হযরত আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় অবস্থা অনুযায়ী বর্ম খুলে ফেলেন, নগ্ন মস্তকে বীরত্বের সাথে জিহাদ করে শহীদ হন। (আল ইসাবা, ৪/৬১৪)

(২) হযরত মুআব্বিয বিন হারিস আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বদর যুদ্ধে তাঁর ভাই হযরত মুয়াযের সাথে মিলে ইসলামের শত্রু আবু জেহেল ওপর এত দ্রুত আক্রমণ করেন যে, তাকে হত্যা করে দেন। এরপর তিনিও বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেন। (আল ইসাবা, ৪/৬১৪-৬/১৫২)

(৩) হযরত ইয়াযিদ বিন হারিস আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বদর যুদ্ধের সময় হাতে থাকা খেজুর ফেলে দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং লড়াই করে শাহাদাতের সূধা পান করেন। (আল ইসাবা, ৪/৬১৪-৬/১৫২)

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام:

(৪) হযরত শায়খ আবদুল্লাহ রেযা সানি হাসানি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ইবাদতের আধিক্য, দুনিয়া বিমুখতা এবং নির্জনবাসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

তিনি আলেম, নেককার, কবি এবং হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি বেশি বেশি নেকির দাওয়াত দিতেন। তাঁর জন্ম বসরায় ১৫০ হিজরির পরে হয় এবং ১৫ই রমযান ২৪৭ হিজরিতে মক্কা মুকাররমায় ওফাত লাভ করেন। (আল ইসাবা, ৬/৫১১)

(৫) হযরত বাওয়া মিরান শাহ সৈয়দ আহমদ মোহাম্মদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের বিজাপুরে হয়। দিল্লিতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে জাহাঙ্গীর বাদশাহর আমলে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। কিছুকাল পর তাজিমি সিজদার প্রতি অস্বীকার করে আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ এবং মদীনা শরীফে মুজাহাদায় ব্যস্ত হন। স্থায়ী অবস্থান ভেরা শরীফ, জেলা সারগোধায় করেন। ১৮ই রমযান ১০৯২ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন। তাঁর মাযার জিয়ারতগাহে পরিণত হয়েছে। (ইতহাফুল আকাবির, পৃষ্ঠা: ১৫৭, উইকিপিডিয়া, নিবন্ধ: আবদুল্লাহ আর রেযা বিন মুসা আল জৌন)

(৬) ভুরে মিয়াঁ খাজা কামালুদ্দিন খান মুজাদ্দেদী রামপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিখ্যাত ওলীআল্লাহ হযরত শাহ দরগাহী মুজাদ্দেদী রামপুরীর মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। দিন-রাত যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর ওফাত ৪ঠা রমযান ১২৮৪ হিজরিতে হয়। রামপুরের পুল পোক্তা মহল্লায় দাফন করা হয়। কিছুকাল পর গম্বুজওয়ালা মাযার নির্মিত হয়।

(মাযারের শিলালিপি, নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২ এপ্রিল ২০২১ ইং)

(৭) হযরত খাজা শাহ মুহাম্মদ ইমাম আলী চিশতী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম সুলতানুত তারেকিন সুফি হামিদুদ্দিন নাগৌরীর বংশে হয় এবং ওফাত ১০ই রমযান ১২৮৬ হিজরিতে হয়। মাযার ঝুনঝুনু (Jhunjhunu), রাজস্থান, ভারতে অবস্থিত। তিনি খাজা আবদুল্লাহ গোলাম ভিক কুড়হাই চিশতীর মুরিদ ও খলিফা এবং খাজা আবদুল গফুর আখুন্দ কাদেরীর খলিফা ও ফয়েয বিতরণকারী ছিলেন।

(তাযকিরায়ে কামেলানে রামপুর, পৃষ্ঠা: ৮৬, ৮৭)

(৮) আধ্যাত্মিক বুযুর্গ খাজা পীর সাইঁ মুহাম্মদ রুকনুদ্দিন নকশবন্দী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম আনুমানিক ১৯৩০ সালে কাশ্মীরের এক ধার্মিক পরিবারে হয়। কিছুকাল চাকরি করেন, তারপর যিকির এবং মুজাহাদায় ব্যস্ত হন। পীর সৈয়দ হায়দার শাহ কালান্দর পাক শরীফ, জেলা কোটলি থেকে বায়আত ও খেলাফত লাভ করেন। তিনি যেসব মসজিদ ও মাদরাসা কায়েম করেছেন, তার সংখ্যা ৩৪। ১১ই রমযান ১৪২১ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন। মাযার রুকনাবাদ শরীফ, সেক্টর এফ ওয়ান, মিরপুর, কাশ্মীরে অবস্থিত। (তাজকিরাতুল আনসাব, পৃষ্ঠা: ৭৯)

ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ:

(৯) শায়খুল হানাফিয়া, হযরত ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ কবির বুখারি হানাফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাওয়ারাননাহর এর বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা আবু হাফস কবিরের কাছে শিক্ষা লাভ করেন এবং আলেম মাওয়ারাননাহরের মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। তিনি নির্ভরযোগ্য আলিম ও ইমাম, দুনিয়া বিমুখতা ও

খোদাভীতির অধিকারী এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। আলিমদের একটি দল তাঁর থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর ওফাত রমযান ২৬৪ হিজরিতে হয়।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪৫৮-১০/৪১৫, ৪১৬)

(১০) হযরত ইমাম উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহিয়া লাইসি মালেকি আন্দালুসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম আন্দালুসের এক জ্ঞানপিপাসু পরিবারে হয়। শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। পিতার ইন্তেকালের পর হারামাইন শরীফাইন এবং মিসর ভ্রমণ করেন এবং ওখানকার আলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেন। ফিরে এসে অধ্যাপনার আসনে বসেন। বহু আলিম তাঁর থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ আলিম, মালেকি ফকিহ, মুসনাদে কর্ডোবা, মেধাবী ও বুদ্ধিমান, দানশীলতার অধিকারী, প্রচুর দান ও অনুগ্রহকারী, সম্পদশালী ও মর্যাদাবান এবং বিশেষ ও সাধারণ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রমযান ২৯৮ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/৭২। আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত, ১৯/২৭৭)

(১১) শায়খ আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মাহবুব মাহবুবী মারওয়াজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় আলিমদের কাছ থেকে লাভ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জনের পর ২৬৫ হিজরিতে তিনি তিরমিয (সুরখান দরিয়া প্রদেশ, উজবেকিস্তান) গমন করেন। সেখানে হযরত ইমাম তিরমিযীর সাহচর্যে থেকে জামে তিরমিযীর পাঠ শ্রবণ করে অনুমতি লাভ করেন। তিনি আলিম, ফাজিল, মুহাদ্দিস, মুসনাদ এবং শায়খুল বালাদ ছিলেন। তাঁর ওফাত রমযান ৩৪৬ হিজরিতে হয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/১৬০। আল ইবার ফি খাবারে মান গাবার, ২/৭৪। আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত, ২/৩১)

(১২) শায়খুল কুররা হযরত আল্লামা ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আবু কাসিম নজ্জাহ উমভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিতা আন্দালুসের শাসক মুয়াইদ বিল্লাহ হিশাম সানি বিন হাকামের গোলাম ছিলেন। তাঁর জন্ম ৪১৩ হিজরিতে কর্ডোবায় হয়। পরে তিনি দানিয়া এবং বালানসিয়ায় স্থানান্তরিত হন। এখানের শ্রেষ্ঠ আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করে তিনি তাঁর সময়ের শায়খ ও ইমামুল কুররা এবং মুফাসসিরে কুরআন হয়ে যান। নেক আমল, দ্বীন, জ্ঞান এবং বুযুর্গিতে তাঁর মর্যাদা অনেক উঁচুতে ছিল। তাঁর ওফাত ১৬ই রমযান ৪৯৬ হিজরিতে হয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৪/২১৬। আলামু লিয যিরকালি, ৩/১৩৭। গায়াতুন নিহায়া, ১/২৮৭। মারিফাতুল কুররা, ২/৮৬২, সংখ্যা: ৫৭২)

মাকতাবাতুল মদীনায়

সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে

খোলাফায়ে রাশেদীন

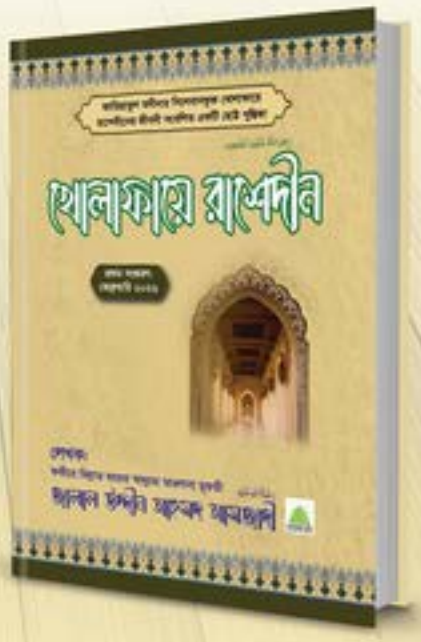

Whatsapp -এ মাকতাবাতুল মদীনার সকল আপডেটকৃত পোস্ট ও ভিডিও পেতে QR code স্ক্যান করুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭১৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Maktaba Tul Madina Bangladesh

01180759